আসাদ বিন হাফিজ
ক্রুসেড-১৭
গাদ্দার
প্রকাশন

ক্রুসেড - ১৭

গাদ্দার

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ১৭

গাদ্দার

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক

আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৩
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ [illegible] ৫০.০০

CRUSADE-17
Guddar
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
Published on: April 2003

PRICE : 3[illegible] ৫০.০০

ISBN 984-581-213-9

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল।
কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়,
কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।
ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর শহর-গ্রামে।
একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল ✖ তুমুল লড়াই ✖ উমরু দরবেশ ✖ টার্গেট ফিলিস্তিন ✖ গাদ্দার

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৮

বিষাক্ত ছোবল

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ।
চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন
হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা?
ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।
তাওহীদুল ইসলাম বাবু
চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের পাঁচটি বই

আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান ✖
অশান্ত চীন সাগর

অচিরেই বেরুচ্ছে অপারেশন সিরিজের পরবর্তী বই

বিধ্বস্ত শহর

পাহাড়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল সাইফুদ্দিন গাজীর নেতৃত্বে এগিয়ে আসা সম্মিলিত বাহিনীর তিন শক্তি। সহসা আকাশ কালো করা ভয়ংকর এক ধূলিঝড় এসে আপতিত হলো ওদের ওপর। সামনে, আশপাশে, চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। ঝড় এত প্রবল বেগে ধাবিত হলো ওদের ওপর দিয়ে, কেউ সামলে উঠার আগেই সম্মিলিত বাহিনী তছনছ হয়ে গেল। সামরিক শৃংখলা ভেঙে যার যার মত ছত্রভঙ্গ হয়ে ওরা ছুটলো পাহাড়ের বড় বড় পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বাঁচার আশায়। ঘোড়া ও উটগুলো ছুটলো লাগামহীনভাবে। সেনাপতি ও কমাণ্ডাররা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে গেল। ঝড় থেমে গেলে আবার গুছিয়ে নেয়া যাবে এমনটি ভাবারও অবকাশ পেল না কেউ।

ঝড়ের বেগ ক্রমে আরও প্রবল থেকে প্রবলতর আকার ধারণ করলো। কেউ কেউ বালির নিচে পুরোপুরি ডুবে গেল। ঝড়ের আঘাতে আহত হয়ে ময়দানে পড়ে রইলো কেউ। যুদ্ধের মালসামান, অস্ত্র ও গোলাবারুদ বালিচাপা পড়লো অধিকাংশই।

এদিকে সুলতান আইয়ুবী ঝড়ের মত এগিয়ে আসা শত্রু বাহিনী বা এই প্রাকৃতিক ধূলিঝড়, কোনকিছু সম্পর্কেই অবগত ছিলেন না। তিনি ব্যস্ত ছিলেন তার রুটিনওয়ার্ক অনুযায়ী সৈনিকদের প্রশিক্ষণ কাজে। সহসা দিগন্তে ধূলিমেঘ দেখেই

সচকিত হলেন তিনি। ভাবলেন, এ কি করে সম্ভব? কি করে গোয়েন্দাদের চোখে ধূলো দিয়ে দুশমন ফৌজ এত কাছে চলে এলো? কিন্তু এটা যে মরু সাইমুম তখনো ভাবতেই পারেননি তিনি।

ছুটে আসা দুশমন বাহিনীর অযাচিত ও আকস্মিক হামলা মোকাবেলা করার জন্য তিনি নিজের বাহিনীকে প্রস্তুত হওয়ার হুকুম দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন এক পাহাড় চূড়ায়, যাতে দুশমন বাহিনীর আকার ও অবস্থা বুঝতে পারেন।

ততক্ষণে বাদামী ঝড় গাঢ় হতে শুরু করেছে। ঝড়ের এ প্রকৃতি দেখে প্রমাদ গুণলেন তিনি। এ তো দুশমন ফৌজের আগমন বার্তা নয়! এ যে মরুভূমির দুঃস্বপ্ন সাইমুম ঝড়!

তিনি উৎকট পেরেশানী নিয়ে মুহূর্তে আবার ছুটে এলেন বাহিনীর কাছে। বললেন, 'যে যেখানে পারো লুকাও! যার যার অস্ত্র নিয়ে বসে পড়ো পাথরের আড়ালে। দুশমন নয়, এখনি তোমাদের ওপর আঘাত হানবে মরু সাইমুম!'

তাঁবু গুটানোরও সময় পেল না সৈনিকরা, যার যার মত ছুটলো আত্মরক্ষা করতে।

এক সময় ঝড় থামলো। পাহাড় ও পাথরের গোপন আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সৈনিকরা। দেখলো, তাঁবুর কোন চিহ্নও নেই সেখানে। খাদ্য ও মালসামানের বহর লণ্ডভণ্ড। সৈন্যরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো উড়িয়ে নেয়া মালামালের সন্ধানে। এভাবেই আল্লাহ সত্যপথের পথিকদের সাহায্য করেন। হয়তো দুই মুসলিম নারীর প্রাণের আকুতি ও প্রার্থনা

আল্লাহর আরশে কাঁপন তুলেছিল। হারেস ও দাউদের মত জানবাজদের আত্মত্যাগে খুশী হয়েছিলেন আল্লাহ জাল্লে শানুহু। দুই মুসলিম মেয়ের আবেগ ও প্রেরণার ইজ্জত রক্ষার্থে আল্লাহ এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন আইয়ুবীর বাহিনীকে।

হারেস ও দাউদ! ফৌজি ও তার ভাবী! ঈমানের পরশদীপ্ত চারটি খাঁটি সোনা। আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান কবুল করা চার বীর মুজাহিদ!

আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তিন মুসলিম গাদ্দারের সম্মিলিত বাহিনী যখন ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে তুর্কমান, এ খবর আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য ছুটছিল দাউদ ও হারেস। কিন্তু দুশমনের গোয়েন্দা বাহিনীর চোখে ধরা পড়ে যায় ওরা। ওদের ধাওয়া করে-দুশমনের গোয়েন্দা বাহিনী। আক্রান্ত হয় ওরা। বীরের মত লড়াই করে ওরা সর্বশক্তি দিয়ে, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারে না।

ওরা মারা গেছে ভেবে দুশমনরা ফিরে যায়। মৃত্যুপথযাত্রী দাউদ বুঝতে পারে তুর্কমান সে কোনদিনই পৌঁছতে পারবে না। কোনদিন সে আর সুলতান আইয়ুবীকে গিয়ে বলতে পারবে না, দুশমন ছুটে আসছে অতর্কিত হামলা করতে। তবু প্রাণ থাকতে সে আশা ছাড়তে রাজি নয়. সে কোন রকমে এ খবর ফৌজিদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

বাড়িতে যুবতী ফৌজি ও তার ভাবী ছাড়া আর কেউ

নেই। এক মুজাহিদের লাশ ও ঘোড়া আল্লাহর হাওলা করে দিয়ে এ খবর নিয়ে অবলা দুই নারী ছুটলো তুর্কমান।

অনেক দূরের পথ, পথে পদে পদে বিপদ, কিন্তু ঈমানের কাছে সব বিপদ হার মানে। ওরা ছুটে চলে তুর্কমান।

পথে ফৌজি দেখতে পায় পাহাড়ের কোলে পড়ে আছে এক মুসাফিরের লাশ। ওরা এগিয়ে যায় লাশের কাছে। দেখতে পায় ওটা লাশ নয়, তারই আপন ভাইয়ের আহত রক্তাক্ত দেহ। সেই রক্তাক্ত দেহকে বুকে জড়িয়ে ফৌজি ও তার ভাবী আবার ছুটতে শুরু করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ব্যথা সবকিছু ছাপিয়ে তাদের মাথায় তখন একটাই চিন্তা, কতক্ষণে তারা পৌঁছবে তুর্কমান, সতর্ক করবে আইয়ুবী ও তার বাহিনীকে। এ সময়ই নেমে আসে সেই প্রলয়ংকরী মরু ঝড়–সাইমুম।

এই ঘটনা প্রমাণ করে, এক বোন তার আহত ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুসলিম মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কাফেরদের অতর্কিত আক্রমণের খবর পৌছানোর জন্য জীবন বাজী রেখে যখন ছুটে যাবে মুসলিম ছাউনিতে, ভাই মারা যাচ্ছে এ নিয়ে দু:খ করারও সময় পাবে না বোন, এই আবেগ ও প্রেরণা যেখানে থাকবে, সেখানে আল্লাহর সাহায্য যুগে যুগে এমনিভাবে হেফাজত করবে মুজাহিদদের।

০

সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্পের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঝড়ে উড়ে গেছে তাঁবু, বাঁধা উট ও ঘোড়া ছুটাছুটি করে

শোচনীয় অবস্থা করেছে নিজেদের। বালির সাথে ছোট ছোট পাথরকুচির আঘাত শরীরে বিদ্ধ হয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিল মানুষ পশু সবাইকে। আহতদের আর্তচিৎকার ভুতপ্রেতের কান্নার মত চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, কিন্তু মনে হচ্ছিল যেন সূর্যকে ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গেছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতা একটু কমতেই কমাণ্ডাররা চিৎকার দিয়ে সৈন্যদের সতর্ক ও তালাশ করতে শুরু করলো। তখনো ঝড় বইছে হালকা, এলোমেলো ভাবে।

তিন চারজন সিপাই এক বিরাট পাথরের আড়ালে আচ্ছন্নের মত বসেছিল। পাশ দিয়ে একটি ঘোড়াকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে দেখলো ওরা। ঘোড়ার ওপর আরোহীও আছে। সিপাইরা চিৎকার করে ডাকলো, 'এাদকে! এদিকে এসো! পড়ে যাবে তো! এমন ঝড়ের সময় কেউ ঘোড়ায় সওয়ার হয়!'

আরেকজন অবাক হয়ে বললো, 'আরে, কি বলছো! আরোহী তো দেখছি মহিলা!'

তখনি পেছনের ঘোড়াটিও চোখে পড়লো ওদের। একজন বললো, 'দু'জন মহিলা!'

এ দুই মহিলা ছিল ফৌজি ও তার ভাবী। সিপাইরা ভাবলো ঝড়ের কবলে পড়ে এরা রাস্তা ভুলে এদিকে এসে পড়েছে।

'ঘোড়ার লাগমটা টেনে ধরো, পাথরের আড়ালে আশ্রয় নাও।'

'আমাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে দাও।' ফৌজি সিপাইদের উদ্দেশ্য করে বললো।

'আরে মারা পড়বে তো! ঝড় থামুক। সুলতান আইয়ুবীকে কি দরকার তোমাদের!' পেরেশান হয়ে প্রশ্ন করলো এক সিপাই।

ঝড়ের শব্দ উপেক্ষা করে কর্কশ কণ্ঠে ফৌজি চিৎকার দিয়ে বললো, 'আহাম্মক! আমাকে জলদি সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে চলো। তিনি কোথায়? আমি খুব জরুরী সংবাদ নিয়ে এসেছি। এ সংবাদ এখনি তাকে জানাতে হবে, নইলে তোমরা সবাই মারা পড়বে।'

সিপাইরা ঘোড়ার উপরে রক্তাক্ত এক লোককেও দেখতে পেলো। ওরা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে অতি কষ্টে সুলতান আইয়ুবীর তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে গেলো ওদের। কিন্তু সেখানে কোন তাঁবু ছিল না, ঝড়ে তাঁবু কোথায় উড়ে গেছে কেউ জানে না।

এক কমাণ্ডার তাদের দেখে এগিয়ে এলো। বললো, 'কি ব্যাপার! কি চাও তোমরা এখানে?'

'আমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে দেখা করতে চাই, এবং এক্ষুণি।' ফৌজি কর্তৃত্বের সুরে বললো কমাণ্ডারকে।

কমাণ্ডার আর কোন প্রশ্ন না করে ওদেরকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে গেল। সুলতান আইয়ুবী তখন এক বিরাট পাথরের আড়ালে বসেছিলেন।

এই প্রলয়ংকরী ঝড় উপেক্ষা করে দু'জন মেয়েকে তার

দিকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি জলদি উঠে দাঁড়ালেন। পাথরের আড়াল ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে এলেন তাদের দিকে।

প্রথমেই হারেসকে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নামানো হলো। সে তখনও জীবিত। ফৌজি দ্রুত ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে সুলতান আইয়ুবীর মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললো, 'মাননীয় সুলতান! সম্মিলিত শত্রুদল আক্রমণের জন্য প্রবলবেগে ধেয়ে আসছে। তারা একদম কাছে চলে এসেছে। যে কোন সময় তারা আপনার বাহিনীর ওপর চড়াও হয়ে যাবে।' সে দাউদের লেখানো চিঠি সুলতান আইয়ুবীর কাছে হস্তান্তর করলো।

হারেস হাত তুলে ইশারায় সুলতানকে কাছে ডাকলো। সুলতান চিঠি না পড়েই এগিয়ে গেলেন তার কাছে। হারেস ফিসফিস করে কিছু বললো। তখনো কথা শেষ হয়নি তার, জবান বন্ধ হয়ে গেল তার। চিরদিনের জন্য নীরব হয়ে গেল এক মুজাহিদ, যেন এ কয়টি কথা বলার জন্যই সে এতক্ষণ বেঁচে ছিল।

একটু পরই ঝড় পুরোপুরি থেমে গেল। সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের ডাকলেন। জরুরী ভিত্তিতে আদেশ দিলেন, 'তাঁবু মেরামতের প্রয়োজন নেই। সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলো। কমাণ্ডো বাহিনীর সৈন্যদের জলদি তলব করো।'

তিনি সেনাপতিদের কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝিয়ে বললেন। বললেন, 'ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করতে

হবে।'

ঝড়ের বেগ পুরোপুরি শান্ত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এলো। সাইফুদ্দিনের নাস্তানাবুদ বাহিনী একে একে তাঁবুর স্থলে ফিরে আসতে লাগলো। তাঁবু নেই, অস্ত্র নেই, খাদ্যভাণ্ডারও লণ্ডভণ্ড। বালির নিচে চাপা পড়া অস্ত্রপাতি খুঁজে বের করতে লেগে গেল কেউ। কেউ ছড়িয়ে পড়লো আশেপাশে, উদ্দেশ্য, উড়িয়ে নেয়া তাঁবু খুঁজে বের করা। আহত সৈনিকদের সেবা করছিল কেউ, কেউ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল সাইফুদ্দিনের। আক্রমণতো দূরের কথা, আক্রমণের চিন্তাও এলো না তার মনে। সবকিছুই এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। উট ও ঘোড়া এদিকে ওদিক ছুটে গিয়েছিল। সেগুলো গুছাতে ও বেঁধে রাখতে রাতের অর্ধেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। এসব করতে করতে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়লো, চোখে নেমে এলো রাজ্যের ঘুম।

সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্পে তখন সাজ সাজ রব। যুদ্ধের তৎপরতা নিয়ে ব্যস্ত সবাই। সাইফুদ্দিনের কোন ধারণাই ছিল না, তাদের থেকে দুই তিন মাইল দূরে কি ঘটছে।

সন্ধ্যার পরপরই আইয়ুবী একদল কমাণ্ডোকে ক্যাম্পের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। ওদের বলে দিলেন, 'সাইফুদ্দিনের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী কোথায় ক্যাম্প করেছে এবং তাদের

এখন অবস্থা কি সব তথ্য নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসবে।'

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলো ওরা। মধ্য রাতের আগেই আইয়ুবীর সৈন্যরা মার্চ করলো। সাইফুদ্দিনের ক্যাম্পের চারদিকে অবস্থান নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে রইলো ওরা।

সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য হলব থেকে বীর বিক্রমে ছুটে আসা সম্মিলিত বাহিনী তখন আইয়ুবীর বাহিনীর ঘেরাওয়ের মধ্যে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ইচ্ছে করলেই আইয়ুবী এখন ওদের নিকেশ করে দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তার বাহিনীকে বললেন, 'রাতের আঁধারে কেউ দুশমনকে আঘাত করতে যেয়ো না। এতে যারা মারা পড়বে তারা তোমাদেরই ভাই। যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে, তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করার দায়িত্ব তোমাদের।'

o

সকাল হলো। সম্মিলিত বাহিনী তখনো ভীষণ অগোছালো। তাদের তাঁবু ও খাদ্যশস্য উড়ে গেছে। ভয়ার্ত ঘোড়ার ছুটাছুটিতে বহু সৈন্য আহত। তারপরও সৈন্যদেরকে তড়িঘড়ি করে সাজানো শুরু হলো। তাতেই কেটে গেল দিনের অর্ধেক বেলা।

সাইফুদ্দিন তার তিন বাহিনীর সেনাপতিকে একত্র করে আদেশ দিলেন, 'জলদি তৈরী হয়ে নাও। সালাহউদ্দিন জানে না আমরা তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছি। এখনও সে নিশ্চয়ই

অপ্রস্তুত অবস্থায় আছে। ঝড়ে আমাদের যতই ক্ষতি হোক, আমরা আমাদের অবশিষ্ট সৈন্য নিয়েই তার বাহিনীর ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাবো।'

দিনের শেষ প্রহরে তারা আক্রমণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করলো। সম্মিলিত সেনাদলের ডাইনে ও বামে উভয় পাশেই পার্বত্য এলাকা, পর্বত জুড়ে পাথর ও ঝোঁপঝাড়। তারা সবে রওনা শুরু করেছে, ঝোঁপঝাড় ও পাথরের আড়াল থেকে শুরু হলো প্রবল তীর বর্ষণ।

সাইফুদ্দিনের বাহিনী প্রথমে থমকে দাঁড়াল, পরে অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়াই করার পরিবর্তে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। ওরা যেই সামনের দিকে পা বাড়াল, সামনে থেকে শুরু হলো আগুনের গোলা বর্ষণ। হাঁড়িতে কাপড় ভরে তাতে জ্বালানী তেল ও পেট্রোল ঢেলে দূর থেকে নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো আগুনের গোলা। সম্মুখ বাহিনীর ওপর এসে পড়তে লাগলো আগুনের লেলিহান শিখা।

আক্রমণের গতি থেমে গেল। সাইফুদ্দিন তার বাহিনী পিছনে সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

আক্রমণের প্ল্যান পাল্টে নতুন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করার কথা ভাবছিল সাইফুদ্দিন. কিন্তু ভাবনা কার্যকরী করার কোন সময় পেল না. যেই তারা পিছনের দিকে সরিয়ে নিল তাদের সৈন্য, তখনই শুরু হলো পিছন থেকে কঠিন আক্রমণ। এ আক্রমণের গতি এত তীব্র ছিল যে, ময়দানে সৈন্যদেরকে শৃংখলাবদ্ধ রাখাই দায় হয়ে পড়লো সাইফুদ্দিনের পক্ষে।

এটা ছিল সুলতান আইয়ুবীর বিশেষ আক্রমণ পদ্ধতি। দুশমনকে ঘেরাও করে তাদের সব আশা-ভরসা চুরমার করে দিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত সৈন্যদের আত্মসমর্পনে বাধ্য করাই এ আক্রমণের লক্ষ্য।

এ জন্য দরকার ত্রাস সৃষ্টি করা। সুলতান এবার সে পদক্ষেপই নিলেন। ওরা যে চারদিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়েছে এ কথা বুঝিয়ে দেয়ার পর এবার পিছন থেকে তীরবেগে অশ্বারোহী বাহিনী ছুটিয়ে দিলেন তাদের ওপর। অশ্বারোহী বাহিনী বর্শা ও তলোয়ারের আঘাত হেনে সাইফুদ্দিনের বাহিনী তছনছ করে দিয়ে একদিক থেকে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইফুদ্দিনের বাহিনীর মনে হলো, তারা কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে। কারণ মুহূর্তের জন্য মাত্র তারা আইয়ুবীর বাহিনীকে দেখতে পেয়েছিল, ওরা একদিক দিয়ে ঢুকে আবার নিমেষেই গায়েব হয়ে গেল অন্যদিক দিয়ে।

দুই পাশ থেকেও একই সাথে আক্রমণ চললো। সাইফুদ্দিনের কেন্দ্রীয় কমাণ্ড শেষ হয়ে গেল।

একটু পর নেমে এলো রাত। সাইফুদ্দিনের বাহিনী রাতের আঁধারে পাহাড়ে চড়ে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ওখানে ওঁৎ পেতে থাকা আইয়ুবীর কমাণ্ডোরা সহজেই তাদেরকে টার্গেট বানিয়ে নিল।

পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, থেকে থেকে ভেসে আসছিল আহত সৈনিকদের আর্ত চিৎকার। রাতেও বিরতি দিয়ে ঝটিকা আক্রমণ চলতে লাগলো অশ্বারোহী বাহিনীর।

সাইফুদ্দিন আশ্রয় নিল পাহাড়ের এক খাঁজের ভেতর। তাঁর বাহিনীর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। কারণ ওরা সামান্য নড়াচড়া করলেই পাহাড় থেকে তাদের ওপর ছুটে আসে তীরের প্রবল বর্ষণ।

সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনী সারা রাত সাইফুদ্দিনের বাহিনীর ওপর কমাণ্ডো আক্রমণ চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে রাখলো তাদের। ময়দানে কোথাও তারা পা জমাতে পারলো না। কোথাও একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারলো না তারা।

ভোর। সুলতান আইয়ুবী এক উঁচু পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা দেখছিলেন। তাঁর বাহিনী যুদ্ধের শেষ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি কাসেদকে তাঁর রিজার্ভ বাহিনীর কমাণ্ডারের কাছে পাঠালেন।

কাসেদ কমাণ্ডারের কাছে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর। সুলতানের রিজার্ভ অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের পেছনে ছুটে এলো পদাতিক বাহিনী। প্রচণ্ড বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো সাইফুদ্দিনের বাহিনীর ওপর। আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। ময়দান জুড়ে তখন চলছিল এক মহা প্রলয়কাণ্ড!

সাইফুদ্দিনের বাহিনীর যুদ্ধ করার কোন ক্ষমতাই রইল না আর। আইয়ুবীর বাহিনীর তুমুল আক্রমণের মুখে মুখ থুবড়ে পড়লো ওরা। এ আক্রমণ প্রতিহত করার সব যোগ্যতা ও ক্ষমতা হারিয়ে তারা চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো।

রাতভর প্রচণ্ড ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে কাটিয়েছে ওরা। ভোরে যখন সুলতান আইয়ুবীর অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে এলো তাদের দিকে, প্রথম আক্রমণেই সাইফুদ্দিনের সৈন্যবাহিনীর মনোবল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সাইফুদ্দিনের মনোবলও ভেঙ্গে গেল। তার চোখের সামনে নেমে এলো ঘোর অন্ধকার। নিজের বাহিনীর দিকে তাকিয়ে সাইফুদ্দিন দেখলো, তার এত কষ্টের সাজানো বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। এখন তারা তার কমাণ্ডের নাগালের বাইরে। যুদ্ধ করার যোগ্যতা হারিয়ে আত্মসমর্পন শুরু করেছে ওরা। যারা আত্মসমর্পন করছে না তারা আইয়ুবীর অশ্বারোহী বাহিনীর পদতলে পিষ্ট হচ্ছে নির্বিচারে। সঙ্গীর দুরবস্থা দেখে পাশের জন অস্ত্র সমর্পণ করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে।

সুলতান আইয়ুবীর যে সৈন্যদল এতক্ষণ পিছনে ছিল তারা বিজয় গর্বে সাইফুদ্দিনের বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে দাঁড়ালো। ডানে ও বায়ে পাহাড়ের ওপর থেকে কমাণ্ডোরা বিজয় উল্লাস করছে। মাঝখানে সাইফুদ্দিনের সৈন্যবাহিনী যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। আত্মরক্ষার শেষ অস্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে আত্মসমর্পনের পথ। এখন কমাণ্ডারের নেতৃত্বেই সৈনিকরা দলে দলে অস্ত্র সমর্পন করে বন্দীত্ব কবুল করে নিচ্ছে।

সাইফুদ্দিনের ক্যাম্পে যখন বিজয়ী বাহিনী পৌঁছলো, তখন সেখানে মদের সুরাহী, কিছু সংখ্যক আনন্দকন্যা ও খেদমতগার ছাড়া সাইফুদ্দিন বা তার রক্ষীদের কেউ ছিল না।

ক্যাম্প এবং ক্যাম্পের আশপাশ থেকে যেসব কয়েদীদের ধরা হলো, তারা বললো, প্রধান সেনাপতি সাইফুদ্দিনকে তারা শেষ বারের মত উপত্যকার আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখেছে, এরপর তার আর কোন খবর তারা জানে না।

সাইফুদ্দিন কোথায় গেছে সে খবর কেউ বলতে পারলো না। সুলতান আইয়ুবী হুকুম দিলেন, 'তোমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো। খুঁজে দেখো সাইফুদ্দিন কোথায় লুকিয়েছে। সে পালিয়ে যাওয়া মানেই আবারও তাকে ষড়যন্ত্র করার অবকাশ দেয়া।'

সাথে সাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো আইয়ুবীর বাহিনী। তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো পাহাড়ের অন্ধিসন্ধি। পাহাড় ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ঘুরে এলো ওরা, কিন্তু কোথাও তাকে আর পাওয়া গেল না। সাইফুদ্দিন পালিয়েছে! নিজের সেনাবাহিনীকে সুলতান আইয়ুবীর দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে কোন ফাঁকে কোথায় পালিয়ে গেছে সাইফুদ্দিন তার বাহিনীও তা জানতে পারেনি।

গভীর রাত। তুর্কমানের সবুজ প্রান্তরের নিরাপদ এক তাবুতে বসেছিল ফৌজি। সামনে তার শহীদ ভাইয়ের লাশ। সফেদ কাপড়ে ঢাকা সে লাশের দিকে তাকিয়ে সে বিড়বিড় করে বলছিল, 'আমি রক্তের নদী পার হয়ে এসেছি। এ নদীতে কোন সেতু নেই। হারেস! ভাই! আমি তোমার ফরজ আদায় করেছি, আমার দায়িত্ব শেষ!

সুলতান আইয়ুবী যখন তার তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, তখন ফৌজি জিজ্ঞেস করলো, 'সুলতান! কি সংবাদ? আমার ভাইয়ের রক্ত তো বৃথা যায়নি?'

'আল্লাহ শত্রুদের পরাজিত করেছেন। তুমিই বিজয়ীনী হে প্রিয় বেটি! হে বীর কন্যা! তুমি....' তিনি আর বলতে পারলেন না, অশ্রুতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো।

তুর্কমানের মহা সমর শেষ হয়েছে। সুলতান আইয়ুবীর সেনাপতি ও কমাণ্ডাররা যুদ্ধের ক্লান্তি ভুলে তাকিয়েছিল ময়দানের দিকে। আল মালেকুস সালেহ, সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনের ঐক্যবদ্ধ সামরিক জোটের কাপুরুষিত আক্রমণের সমুচিত জবাব দিতে পেরে তারা আনন্দিত। কিন্তু আইয়ুবীর চোখে সে আনন্দের রেশও নেই। যদিও বিপুল সংখ্যক পরাজিত সৈন্যকে অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করতে পেরেছেন, কিন্তু এ যুদ্ধে আহত ও নিহত সৈনিকের সংখ্যাও কম নয়। সেদিকেই বিমর্ষ নয়নে তাকিয়েছিলেন তিনি।

সুলতান আইয়ুবীর সামনে পড়েছিল শত্রুদের লাশ, আহতরা ছটফট করছিল। তীরবিদ্ধ উট ও আহত ঘোড়াগুলো তখনো ময়দান জুড়ে ছুটাছুটি করছে। তাদের পদতলে পিষে মরছে আহত শত্রু সৈন্যরা।

শত্রুদের যে সকল সৈন্য পালাতে পারেনি, তারা অস্ত্র সমর্পণ করে আশ্রয় নিয়েছিল আইয়ুবীর সৈন্যদের ঘেরাওয়ের ভেতর। অসংখ্য ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, তীর, ধনুক, তীরকোষ,

তাঁবু ও সৈন্যদের ব্যক্তিগত মালামাল, নগদ অর্থ ও অন্যান্য দামী মালসামান জমা করছিল আইয়ুবীর সৈন্যদের সামনে।

দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মালামাল সংগ্রহ করে আনছিল আইয়ুবীর রিজার্ভ বাহিনীর সৈন্যরা।

সুলতান আইয়ুবী সম্মিলিত বাহিনীর সুপ্রিম কমাণ্ডের হেডকোয়ার্টার সাইফুদ্দিন গাজীর পরিত্যক্ত তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। এই সে তাঁবু, যেখানে একটু আগেও জাতির এক গাদ্দার অবস্থান করছিল। মুজাহিদদের তলোয়ারের চমক দেখে তার সৈন্যরা যখন নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পনের পথ ধরলো, এ গাদ্দারের সে সাহসটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না। আত্মসমর্পনের পরিবর্তে পালিয়ে গেল সে। পালিয়ে গেল ভীরু ও কাপুরুষের মত, নিজের বাহিনী এবং সমস্ত মালসামান ও সৈন্যসামন্ত ফেলে রেখে। তার সাথে যেসব মেয়ে, নর্তকী, গায়িকা এবং বাজনাদারেরা ছিল, যেসব সোনার মোহর ও বাক্স ভর্তি নগদ টাকা-পয়সা ছিল, সবই পড়েছিল সেখানে।

তার সৈন্যদের বেতন ও খরচের টাকা এবং সুলতান আইয়ুবীর লোকদের দলছুট করানোর জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সে রিজার্ভ করে রেখেছিল, সমুদয় সম্পদ পড়েছিল বেওয়ারিশ হয়ে। সাইফুদ্দিনের তাঁবুও ছিল মূল্যবান কাপড়ের। রেশমী কাপড়ের পর্দা ও সামিয়ানা দিয়ে সুন্দর এক মহল বানিয়ে নিয়েছিল সে নিজের জন্য।

সে যুগের যুদ্ধ ময়দানে রাজমহলের সকল আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকতো রাজা-বাদশাহদের জন্য। সাইফুদ্দিন

কেবল একজন সেনানায়কই ছিল না, সেই সাথে একজন শাসকও ছিল। ফলে মদের সুরাহী, রঙ বেরঙয়ের পিয়ালা, গায়িকা, নর্তকী সবই তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু প্রাণের মায়া এমন এক মায়া যে, এর জন্য দুনিয়ার সবকিছুই ত্যাগ করা যায়। সাইফুদ্দিনও তাই করেছিল, সবকিছু ফেলে সে পালিয়ে গিয়েছিল অজানা গন্তব্যে।

সুলতান আইয়ুবী কারুকার্যখচিত বর্ণালী কাপড়ের এই মনোমুগ্ধকর মহল তাকিয়ে দেখছিলেন। তার দৃষ্টি পড়লো রাজকীয় পালঙ্কের ওপর, যেখানে পড়ে আছে এক শাহী তলোয়ার। এর বাট ও খাপ কারুকার্য খচিত। সাইফুদ্দিন কি তাহলে এতটাই ভয় পেয়েছিল যে, তলোয়ারের মত নিত্য সাথী অস্ত্র নিতেও ভুলে গেছে!

সুলতান আইয়ুবী তলোয়ারটি হাতে উঠিয়ে নিলেন। তলোয়ারটি খাপমুক্ত করতেই তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। তিনি তলোয়ারটির চমক দেখে পাশে দাঁড়ানো এক সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মুসলমানের তলোয়ারে যখন নারী ও মদের ছায়া পড়ে, তখন তা আর তলোয়ার থাকে না, তা হয়ে যায় নিষ্ক্রিয় এক টুকরো লোহা। অস্ত্র হিসাবে তার আর কোন মূল্য থাকে না।

এই তলোয়ার ফিলিস্তিন বিজয়ের জন্য তৈরী হয়েছিল। কিন্তু খৃস্টানরা পাপের মধ্যে ডুবিয়ে এটাকে কাঠের তলোয়ারের মত নিষ্ক্রিয় ও দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করেছে। তলোয়ার ধরার হাতে যদি মদের ছোঁয়া লাগে, সে হাতের অস্ত্র রক্তের পরশ

থেকে বঞ্চিত হয়।'

সেই মনোরম প্রশস্ত তাঁবুতে সুন্দরী অর্ধ উলঙ্গ যুবতী মেয়েরা ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। তাদের ভাগ্যে এখন কি মুসিবত নেমে আসবে সে কথাই মনে মনে কল্পনা করছিল ওরা। বিজয়ী সৈন্যদের হাতে এখন তাদের কি গতি হবে, কেমন ব্যবহার করা হবে তাদের সাথে- এই চিন্তায় ও ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল তাদের।

এমন আকর্ষণীয় দেহবল্লরী ও যুবতী নারী দেখলে কে না পশু হয়ে যায়! যদি আইয়ুবীর সৈন্যদের মধ্যে সেই পশুত্ব জেগে উঠে তাহলে তাদের হয়তো দোষ দেয়া যাবে না, কিন্তু কতজন পশুর বর্বরতা তারা সইতে পারবে? তারা যখন এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল, তখনই তাদের কানে এলো সুলতান আইয়ুবীর আদেশ।

'এসব মেয়েদের এখান থেকে নিয়ে যাও। তারা এখন স্বাধীন। তারা যে যেখানে যেতে চায় তাদের সসম্মানে এবং পূর্ণ নিরাপত্তা ও হেফাজতের সাথে সেখানে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করো।'

এ কথা শুনে তারা আরও ভীত হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো, এসবই কথার কথা, তাদেরকে অসহায় পেয়ে সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়ার এটা একটা কৌশলমাত্র।

তাদের মধ্য থেকে এ সময় এক মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে করজোড়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'মাননীয় সুলতান! আপনি জানেন, আমরা অসহায়, কিন্তু আল্লাহর কসম

খেয়ে বলছি, আমরা নিরপরাধ। এ যুদ্ধের ব্যাপারে আমাদের কোন হাত বা ভূমিকা ছিল না। আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। শুনেছি আপনি নারীর বেইজ্জতি পছন্দ করেন না। দয়া করে আমাদেরকে আপনার সৈন্যদের হাতে তুলে দেবেন না।

জানি, আমাদের ইজ্জতের কোন দাম নেই। কিন্তু আমাদের অসহায়ত্বের দিকে তাকিয়ে আমাদের ওপর রহম করুন। এমন শাস্তি আমাদের দিয়েন না, যা সইবার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমরা আপনার মহানুভবতা ও বিরত্বের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।'

তার কণ্ঠের ভাষার চাইতেও তার চোখের ভয়-বিহবলতা সুলতানের মনে দাগ কাটলো বেশী। তিনি মেয়েটির আবেদন মঞ্জুর করে বললেন, 'আমার সৈনিকদের কাছে থাকলেও তোমাদের কোন অমর্যাদা ও ভয়ের কারণ ছিল না। তবু তোমরা যখন এতোই ভয় পাচ্ছো, তখন তোমাদেরকে আমার হেফাজতেই রাখা হবে। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের দেখাশোনা করবে আমার নিজস্ব রক্ষী ও রিজার্ভ বাহিনী।'

সুলতান আইয়ুবী যুদ্ধের ময়দানে নারীর সংশ্রব মোটেই সহ্য করতেন না। তিনি তাদেরকে নিজ নিজ ইচ্ছামত যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার জন্য কে কোথায় যেতে চায় জানতে চাইলেন। বললেন, 'তোমরা এখানে মোট কত জন আছো এবং কে কোথায় যেতে চাও?'

জবাবে তারা নিজেদের সংখ্যা উল্লেখ করে সুলতানকে জানালো, 'আমরা এখানে এখন যারা উপস্থিত আছি, সবাই

মুসলমান। আমাদের সাথে আরো দুটি মেয়ে ছিল, তারা ছিল খৃস্টান। আমাদের মুনীব চলে যাওয়ার পর থেকে সে দু'জনও নিখোঁজ আছে। তারা দু'জনই ছিল সাইফুদ্দিনের খুব প্রিয় এবং সব সময় তারা মুনীবের সাথে লেগে থাকতো। মনে হয় তারা দু'জন মুনীবের সাথেই পালিয়ে গেছে।'

সুলতান এবং তার সেনাপতিরাও এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন যে, সেই মেয়ে দুটি সাইফুদ্দিনের সাথেই পালিয়ে গেছে। এতে কোন সন্দেহ বা দ্বিমতের অবকাশ রইলো না! এ জন্য যে, তারা জানতেন, কোন মুসলমান শাসকই তখন খৃস্টানদের বেস্টনীর বাইরে ছিল না। খৃস্টানদের চর সব সময় তাদের ঘিরে রাখতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘিরে রাখার এ দায়িত্বটি পালন করতে হতো কোন না কোন খৃস্টান যুবতীর। তারাই ছিল বলতে গেলে তার পৃষ্ঠপোষক, উপদেষ্টা এবং মনোরঞ্জক।

সে যুগে যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ীরা প্রতিপক্ষের মালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। অধিকাংশ সৈন্য পরাজিত সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের তাঁবু ও ক্যাম্প লুট করার জন্য ছুটে যেতো। হেডকোয়ার্টার লুটের সুযোগ পেলে তো কোন কথাই নেই। সেখানকার সব সম্পদ, নারী ও মদ আপন দখলে নেয়ার জন্য চলতো প্রতিযোগিতা। ঝড়ের মত লুটপাট চলতো। আর এ লুটপাট চালাতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বেঁধে যেতো দাঙ্গা-ফ্যাসাদ। কখনো কখনো এ দাঙ্গার ফলে লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যেতো সেখানে।

কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর বাহিনীর অবস্থা ছিল ভিন্ন। তাঁর কঠোর আদেশ ছিল, কেউ যেন গনিমতের মালে হাত না দেয়। যত বড় সামরিক অফিসারই হোক না কেন, কারো সাধ্য ছিল না সুলতানের আদেশ অমান্য করে গনিমতের মাল কুক্ষিগত করে। গনিমতের মাল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার দায়িত্ব নির্দিষ্ট বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করা হতো। সংগৃহীত মালামাল বন্টনের দায়িত্ব পালন করতেন সুলতান নিজে।

তুর্কমানের যুদ্ধ শেষ। মালামাল সংগ্রহের পর সৈনিকরা গনিমতের মাল বন্টনের ব্যাপারে সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তিনি এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা আদেশ জারী না করে সৈনিকদের হুকুম দিলেন ময়দান থেকে নিজেদের এবং শত্রুদের সকল আহত সৈনিককে এনে তাদের সেবা ও চিকিৎসা করার।

সুলতানের নির্দেশ পেয়ে সারা ময়দান ঘুরে যেখানে যত জখমী সৈনিক ছিল তাদেরকে এক জায়গায় এনে জড়ো করা হলো। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাদের আহত স্থানে ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করার কাজ। চিকিৎসকদের সাথে এ কাজে হাত লাগালো সাধারণ সৈন্যরাও। স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সকল আহত সৈনিকের চিকিৎসা ও মলম পট্টির কাজ শেষ হলে সুলতান দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করলেন।

'এবার আমাদের আহত মুজাহিদ এবং আহত যুদ্ধ বন্দীদের পৃথক করে দাও।'

সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীতে ডিসিপ্লিন রক্ষার গুরুত্ব

ছিল সর্বাধিক। তিনি সামরিক বাহিনীর শৃংখলা ভঙ্গকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করতেন। ফলে তার বাহিনী ছিল খুবই সুশৃংখল। এই যুদ্ধে কিছুসংখ্যক শত্রু সৈন্য এলোমেলোভাবে যে যেদিকে পারে পালিয়েছিল। সুলতানের বাহিনী পালিয়ে যাওয়া এসব সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করেছিল। কিন্তু তাদের ট্রেনিং এমন ছিল যে, পিছু ধাওয়া করার সময়ও তারা একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক অটুট রাখতো। সুলতান আইয়ুবী তাদেরকে পিছু ধাওয়া করে বেশী দূর যেতে নিষেধ করেছিলেন।

যুদ্ধের সময় তিনি একদল সৈন্যকে ময়দানের ডানে ও বামে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ওপর নির্দেশ ছিল, সুলতানের পরবর্তী হুকুম না পাওয়া পর্যন্ত তারা যেন তাদের অবস্থানে সুশৃংখলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। যুদ্ধ শেষ হলেও সেই বাহিনীকে তিনি সেখান থেকে সরে আসার নির্দেশ দেননি। ফলে তারা তখনো পূর্ব অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল।

আহত সৈন্যদের আলাদা করার পর রিজার্ভ বাহিনীর সালার সুলতানের কাছে এগিয়ে গেল। সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো, 'সুলতান, শত্রুদের অস্ত্রশস্ত্র, মালসামান, ঘোড়া সবই সংগ্রহ করা হয়েছে। গনিমতের এসব মাল সম্পর্কে আপনার আদেশ কি?'

সুলতান পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে। বললেন, 'যুদ্ধ শেষ হয়েছে এ কথা তোমাকে কে বললো? খুশীতে বিভোর হওয়ার মত সময় এখনও আসেনি আমাদের। আমার শিক্ষা

এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তো চলবে না, বিজয়ের পূর্ণতা পাওয়ার আগে গনিমত বন্টনের কথা আমি কখনোই ভাবি না। আমার বিবেচনায় আমরা শত্রুদের একটি বৃহৎ দলকে বিচ্ছিন্ন করেছি মাত্র। কিছু সংখ্যক সৈন্য নিহত এবং কিছু সৈন্যকে আমরা বন্দীও করেছি ঠিক, কিন্তু আমার বিশ্বাস, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

আমাদের বাহিনী কি কোন পার্শ্ব আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে? না, হয়নি। কিন্তু এমনটি হওয়ার কথা ছিল না। মূল বাহিনীর ডানে বায়ে রক্ষী বাহিনী মোতায়েন না করে ময়দানে আসার কথা নয় সাইফুদ্দিনের। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের উভয় পাশে এখনও শত্রু বাহিনী ওঁৎ পেতে আছে। ময়দানে না আসার কারণে এখনও যথেষ্ট শাক্তশালী ও সুরক্ষিত থাকার কথা ওদের। তারা যোদ্ধা সৈনিক, যদিও ঈমান বেচা গাদ্দার। কিন্তু এত আনাড়ী নয় যে, তাদের যে ব্যাটেলিয়ান যুদ্ধে অংশ নেয়নি, তারা বিনা যুদ্ধেই ফিরে যাবে? মনে হয়, সুরক্ষিত দল পলাতক সৈন্যদের গুছিয়ে নিয়ে আবার আক্রমণ চালাবে।'

'তাদের কেন্দ্রীয় কমাণ্ড তো শেষ হয়ে গেছে, সম্মানিত সুলতান!' এক সেনাপতি বললো, 'সৈন্য থাকলেও এখন তাদের কমাণ্ড করার আর কেউ নেই।'

'আছে, কেউ না থাকুক খৃস্টানরা তো আছে। যাদের সাথে এতক্ষণ যুদ্ধ করলে তারা আমাদের মূল শত্রু নয়, এরা তো আসলে খৃস্টানদের হাতের পুতুলমাত্র। খৃস্টানরা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এ লড়াই চলতেই থাকবে।'

সুলতান আইয়ুবী আরো বললেন, 'যদিও কোন দিক থেকে কোন সংবাদ আসছে না, কিন্তু আমি নিশ্চিত, খৃস্টানরা কাছেই কোথাও গোপনে সৈন্য ও অস্ত্র মজুদ করে রেখেছে। এটা পার্বত্য এলাকা। এখানে আছে অসংখ্য গলিঘুপচি। উঁচু টিলার আড়ালে আছে গভীর নিম্নাঞ্চল। কোথাও কোথাও আবার গভীর জঙ্গলও রয়েছে। ফলে এই অরণ্য বা টিলার আড়ালে কি আছে কিছুই দেখা যায় না। এই সুবিধাটুকুই ভোগ করছে দুশমন। লুকিয়ে আছে দৃষ্টির অন্তরালে।'

'তেমন কিছু হলে আমরা কি খবর পেতাম না? আমাদের টহল বাহিনীর চোখে কি কিছুই ধরা পড়তো না?' বললো এক সেনাপতি।

'শত্রু ও বিষধর সাপকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই, মরার সময়ও তা দংশন করে বসে। বেশ কিছু দিন হলো আমি সাইফুদ্দিনের সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনের কোন সংবাদ পাচ্ছি না। তোমরা সবাই জানো, মুজাফফরুদ্দিন এত সহজে পালানোর মত সেনাপতি নয়। খৃস্টানদের সহযোগিতা নিয়ে কখন মুজাফফরুদ্দিন ময়দানে আসে আমি তারই অপেক্ষা করছি। তোমরাও চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখো। সৈন্যদের সংহত করে প্রস্তুত রাখো তাদের। আমি মুজাফফরুদ্দিনকে যতটুকু চিনি, তাতে তোমাদের এ নিশ্চয়তা দিতে পারি, ওই সাপ অবশ্যই আমাদের ওপর ছোবল হানবে, মৃত্যুপথযাত্রী হলেও সে চেষ্টা করবে শেষবারের মত আমাদের ওপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে।'

সুলতান আইয়ুবীর এ আশংকা ভিত্তিহীন ছিল না। তিনি হিম্মত পর্বত শৃঙ্গের যুদ্ধে সাইফুদ্দিনের সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনকে ভাল মতই শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে শিক্ষার কথা ভুলে গিয়ে না থাকলে প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা মুজাফফরুদ্দিন অবশ্যই করবে।

এই মুজাফফরুদ্দিন এক কালে সুলতান আইয়ুবীরই সেনা সদস্য ছিল। নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাগুণে দৃষ্টি কেড়েছিল আইয়ুবীর। আইয়ুবী তাকে ধাপে ধাপে প্রমোশন দিয়ে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। গাদ্দারীর খাতায় নাম লেখানোর সময় সে-ই ছিল সুলতান আইয়ুবীর সেনাপতির দায়িত্বে। সুলতান তাকে এতটাই বিশ্বাস করেছিলেন যে, সেনাবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমাণ্ড তিনি তার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার মোহ এমন এক দুরারোগ্য ব্যাধি, যা বশে রাখতে না পারলে তা নিজের বিবেক ও মনুষত্বকেই ধ্বংস করে দেয়। মুজাফফরুদ্দিনকেও ধরেছিল সেই দুরারোগ্য ব্যাধিতে। আইয়ুবীর বাহিনীর সেনাপতি হওয়ার পরও গাদ্দারের খাতায় নাম লেখাতে বাঁধেনি তার।

ফলে তারা উভয়ে উভয়কে ভাল মতো চিনতো। সুলতান আইয়ুবীর যুদ্ধ কৌশল, নিপূণতা ও দক্ষতার কথা যেমন জানা ছিল মুজাফফরুদ্দিনের, তেমনি আইয়ুবীরও জানা ছিল মুজাফফরুদ্দিনের দৌড় কতদূর যেতে পারে।

মুজাফফরুদ্দিনের এ দিকটিও সুলতান নজরে

রেখেছিলেন যে, সে জন্মগতভাবেই যোদ্ধা প্রকৃতির লোক, এটা তার বংশীয় উত্তরাধিকার। আর সে সামরিক শিক্ষা লাভ করেছে সুলতানের নিজের কাছেই। যুদ্ধের ময়দান থেকে পালানোর শিক্ষা তিনি তাকে দেননি।

মুজাফফরুদ্দিন ছিল সাইফুদ্দিনের নিকটাত্মীয় অর্থাৎ চাচাতো ভাই। সুলতান আইয়ুবী যখন মিশর থেকে দামেশকে চলে আসেন তখন সেখানকার একদল মুসলমান আমীর সুলতানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাঁধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল। সে সময় দৃশ্যতঃ শক্তির পাল্লা ভারী ছিল ওই ষড়যন্ত্রকারীদের। সাইফুদ্দিন তখন তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল। আত্মীয়তার সূত্র ধরে মুজাফফরুদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করে সাইফুদ্দিন এবং তার মধ্যে সৃষ্টি করে লোভ ও ক্ষমতার মোহ। সেই মোহ তাকে আর সুলতানের দলে থাকতে দেয়নি। মুজাফফরুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীকে কিছু না বলে পালিয়ে গিয়ে যোগ দেয় সাইফুদ্দিনের সাথে। উদ্দেশ্য, দুই ভাই মিলে নতুন এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলবে। কিন্তু সে স্বপ্ন তাদের এখনো পূরণ হয়নি।

তুর্কমান যুদ্ধের আগে হিম্মাত পর্বত শৃঙ্গের যুদ্ধে সুলতান প্রথম মুজাফফরুদ্দিনের মুখোমুখি হন। মুজাফফরুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর পার্শ্বদেশ থেকে এমন আক্রমণ চালিয়েছিল যে, সে আক্রমণ ঠেকাতে শেষ পর্যন্ত সুলতান আইয়ুবীকে নিজের হাতে কমাণ্ড নিয়ে সরাসরি ময়দানে নেমে আসতে হয়েছিল।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, যদি সুলতান আইয়ুবী

সে যুদ্ধে নিজের হাতে কমাণ্ড নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়তেন, তবে যুদ্ধের ফলাফল হতো ভিন্ন রকম।

সে যুদ্ধে মুজাফফরুদ্দিন সেনানায়ক হিসেবে যথেষ্ট দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছিল। সমর নৈপূণ্যের ওস্তাদী প্রদর্শনে সে কোনরূপ কার্পণ্য করেনি, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, সে লড়ছিল তারই ওস্তাদ সুলতান আইয়ুবীর সাথে, যে জন্য বিজয়ের দেখা পাওয়া তার ভাগ্যে ঘটেনি।

মরু সাইমুম উপেক্ষা করে ছুটে আসা মিল্লাতের এক দুঃসাহসী কন্যা ফৌজির কাছ থেকে খবর পেয়ে আইয়ুবীর গোয়েন্দারা ছুটে গিয়েছিল তুর্কমানের সেই ময়দানে। সেখান থেকে তারা সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর যেসব তথ্য ও বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিল সুলতানের কাছে তা যথাসময়েই পৌঁছে দিয়েছিল। গোয়েন্দা বাহিনীর দেয়া সে তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়, মুজাফফরুদ্দিনও এ বাহিনীর সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে সে ঠিক কোথায় ছিল, অগ্রবর্তী বাহিনীতে, নাকি মূল বাহিনীতে, না ডান ও বায়ের রিজার্ভ বাহিনীতে, তার কিছুই জানার সুযোগ হয়নি। এটা জানা থাকলে সুলতান এখন ঠিকই আন্দাজ করতে পারতেন, মুজাফফরুদ্দিন এখন কোথায় কি করছে।

সুলতান আইয়ুবী কয়েকজন যুদ্ধবন্দীকে ডেকে এনে মুজাফফরুদ্দিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা জানালো, তিনি সম্মিলিত বাহিনীর সাথেই ছিলেন। কিন্তু এখন কোথায় তা তারা বলতে পারে না।

হতে পারে বন্দীরা আসলেই মুজাফফরুদ্দিন সম্পর্কে বেশী কিছু জানে না অথবা জেনেও তারা তা গোপন করে গেছে। ঘটনা যাই হোক, সুলতান আইয়ুবী যে তার ব্যাপারে তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেন না এটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ালো।

তিনি সেনাপতিদের বললেন, 'আমি বিশ্বাস করি না, সে যুদ্ধ না করে পালিয়ে গেছে। সে আমার সাগরেদ! আমি তার সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে জানি। কেবল তার যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কেই জানি না, তার স্বভাব চরিত্র সম্পর্কেও ভাল রকম খবর রাখি। সে অবশ্যই আক্রমণ চালাবে। সে যদি মনে করে যুদ্ধে পরাজিত হবে, তবুও সে আক্রমণ চালাবে। তাকে আক্রমণ চালাতেই হবে, কারণ প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করা পর্যন্ত তার নাওয়া খাওয়া ঘুম সব হারাম হয়ে যাবে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী আর যাই হোক, এ কথা মানতে পারে না, মুজাফফরুদ্দিন পালিয়ে গেছে।'

সুলতান আইয়ুবী এত জোর দিয়ে এ কথা বলার পেছনে একটা কারণ আছে। হিম্মাত পর্বত শৃঙ্গের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন চিৎকার করে বলছিল, 'সালাহউদ্দিন, আবার আমাদের দেখা হবে যুদ্ধের ময়দানে। যতক্ষণ তোমাকে পরাজিত করতে না পারবো বা নিজে নিঃশেষ হয়ে যাবো ততক্ষণ আমি ক্ষান্ত হবো না।' মুজাফফরুদ্দিনের মুখের সে আওয়াজ বহু দূর থেকেও সৈনিকরা শুনতে পাচ্ছিল।

তুর্কমান রণাঙ্গণ থেকে বহু দূরে হিম্মাত পর্বত শৃঙ্গের সে

আওয়াজ এখনো যেন সুলতান শুনতে পাচ্ছেন। সাইফুদ্দিনের পরিত্যক্ত ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে সে আওয়াজের প্রতিধ্বনিই শুনছিলেন আইয়ুবী।

তুর্কমান যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্ত। সাইফুদ্দিনের এক গোয়েন্দা কমাণ্ডার মুজাফফরুদ্দিনের কাছে পৌঁছে বললো, 'এই মাত্র দু'জন অশ্বারোহীকে দূর থেকে দেখতে পেলাম, তারা তীর বেগে ছুটে যাচ্ছে আইয়ুবীর ক্যাম্পের দিকে। সম্ভবত এরা আইয়ুবীর তথ্য অনুসন্ধানী সদস্য। যদি আমার অনুমান সঠিক হয় তাহলে বলতে পারি, আক্রমণের আগেই আমাদের এখানে এসে পৌঁছার সংবাদ সুলতান সালাহউদ্দিনের কাছে পৌঁছে যাবে। আর আইয়ুবী আমাদের আক্রমণের খবর পাওয়ার মানে হচ্ছে, যত সহজে আমরা বিজয় আশা করছি তা সম্ভব হবে না। আমাদের আক্রমণের আগেই সে আমাদের বাঁধা দিতে ছুটে আসবে।'

মুজাফফরুদ্দিনের জন্য এ ছিল এক তাৎপর্যময় খবর। সে আর কালবিলম্ব না করে কাউকে কিছু না জানিয়ে যুদ্ধের ছক নতুন করে আঁকলো। আইয়ুবীর বিরুদ্ধে এখন এখানে মুখোমুখি যুদ্ধ করা বৃথা। এ মুহূর্তে এ যুদ্ধে জয় লাভ করার একটাই উপায়, প্রাথমিক লড়াই থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেয়া। সবচেয়ে ভাল হয়, বাহিনীকে কোন নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। তারপর যদি আইয়ুবী জিতেই যায়, তখন বিজয়ের আনন্দে

বিভোর হয়ে ওরা যখন মেতে উঠবে আনন্দ কোলাহলে, তখন তাদের ওপর অতর্কিতে চড়াও হওয়াটাই হবে তার একমাত্র কাজ।

সেই মোক্ষম সময় আসার আগ পর্যন্ত ময়দান থেকে নিজের বাহিনী সরিয়ে নেয়ার দ্রুত উদ্যোগ নিল মুজাফফরুদ্দিন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই সে তার বাহিনী নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লো।

'আমরা আপনার প্রতিটি আদেশ পালন করবো।' মুজাফফরুদ্দিনের এক সহ-সেনাপতি বললো, 'কিন্তু এই অবস্থায়, যখন আমাদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত, সৈন্যদের অধিকাংশই হয় মৃত, আহত বা বন্দী, যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত, সেই অবস্থায় আমাদের এই সামান্য সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালানো মোটেই সমীচীন হবে না।'

'আমার এই সৈন্যবাহিনীকে আমি নগণ্য সংখ্যক বলতে পারি না। একেই আমি যথেষ্ট মনে করি।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'এই সৈন্য আমাদের সম্মিলিত সৈন্যের এক চতুর্থাংশ। সুলতান আইয়ুবী এর চেয়েও কম সংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতেন ও সফলতা লাভ করতেন। আমি তার বাহিনীর এক পাশ থেকে আক্রমণ করবো। তাকে সে কৌশল চালানোর সুযোগ দেবো না, যে কৌশল তিনি হিম্মাত পর্বত শৃঙ্গে চালিয়েছিলেন। তোমরা সবাই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত

হয়ে নাও।'

'আমাদের সুপ্রিম কমাণ্ড সাইফুদ্দিন গাজী মুশেলের আমীরসহ তিনটি বাহিনীর সম্মিলিত ফোর্স নিয়েও হেরে গেলেন।' সহ-সেনাপতি বললো, 'আমাদের পরামর্শ নিয়ে আবারও চিন্তা করুন। কারণ এই সামান্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করা আত্মহত্যার সামিল।'

'যুদ্ধের ময়দান নারী, মদের পিপা ও সুরাহী রাখা লোক দিয়ে ভরে ফেললেই যুদ্ধ জয় করা যায় না। মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিন সে চেষ্টা করতে গিয়েই পরাজিত হয়েছে।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'আমিও শারাব পান করি। কিন্তু সব সময় না। সুলতান আইয়ুবী আমাকে গাদ্দার বলে গাল দেয়। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার সময় সে যখন চিন্তা করে না আমি তার সাগরেদ ছিলাম, তখন আমিও এ কথা মনে রাখতে চাই না, তিনি আমার ওস্তাদ ছিলেন। তিনি আমাকে গাদ্দার বলেন, আমি গাদ্দার নাকি মুসলমান এখন আর এ হিসাব করতে চাই না। আমার হিসাব হচ্ছে, এখানে দুই সেনাপতির লড়াই ও সংঘর্ষ হবে, দুই বীর যোদ্ধার শক্তি পরীক্ষা হবে। এ শক্তি পরীক্ষায় দুই তলোয়ারের সংঘর্ষে সেই জিতবে, যার বাহুর জোর বেশী। আমার বাহুর উপর আমার আস্থা আছে। তোমরা নিজেদের বাহিনী প্রস্তুত করো।'

মুজাফফরুদ্দিনকে বুঝানোর চেষ্টা বৃথা ভেবে সহ-সেনাপতি যাবার জন্য পা বাড়ালো. মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'আর স্মরণ রেখো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের দৃষ্টি

মাটির নিচেও যেতে পারে। তোমাদের থাকতে হবে খুবই হুশিয়ার। মোক্ষম সময়ের জন্য আমাকে হয়তো আরো কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। সুলতান আইয়ুবী খেকশিয়ালের মতই চালাক আর খরগোশের মত ক্ষীপ্র। আমাকে আমার গোয়েন্দারা জানিয়েছে, তিনি এখনও গনিমতের মাল বন্টন শুরু করেননি। তার সৈন্যদেরও স্ব-স্ব স্থান ত্যাগ করার হুকুম দেননি। এতে বোঝা যায়, তিনি আর অগ্রাভিযান চালাবেন না। আর এ কথাও আমার মোটেও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না, তিনি আশংকা করছেন, আমরা আবারও তার ওপর আক্রমণ চালাতে পারি।

আমি ভাল ভাবেই জানি, তিনি কেমন ধরনের চিন্তা করছেন। আমি তাকে ধোঁকা দেবো, তাকে বুঝিয়ে দেবো, আমরা সবাই পালিয়ে গেছি। এখন আর বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। এরপর শুরু হবে যুদ্ধের নতুন খেলা। অস্ত্র নয়, শুরু হবে বুদ্ধির লড়াই।

এ জন্য দিন দুইয়ের বেশী তোমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। তার গতিবিধির ওপর আমি পূর্ণ নজর রাখছি। তার গোয়েন্দারা ঘুরবে বুকে সন্দেহ আর সংশয় নিয়ে আর আমার গোয়েন্দারা নজর রাখবে তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর স্থির লক্ষ্যে। যখনই আইয়ুবী তার সৈন্যদের মাঝে লুটের মাল বন্টন করতে আরম্ভ করবে, তখনই আসবে সেই কাংখিত সময়। তখন সৈন্যদের শৃংখলা ভেঙ্গে যাবে, লক্ষ্য থাকবে শুধু গনিমতের মালের দিকে, তখন আমি অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে

পড়বো তাদের ওপর।

সুলতানের মত আমিও জানি, অস্ত্র বা লোকবল দিয়ে যুদ্ধে বিজয় আসে না, যুদ্ধে জয় হয় শত্রুর দুর্বল জায়গায় সময় মত আঘাত হানার মাধ্যমে। আইয়ুবী বহু লড়াই করেছে, কিন্তু কেউ তার দুর্বল জায়গায় সময় মত আঘাত হানতে পারেনি। ফলে বার বার সে বিজয়ী হয়েছে, কিন্তু সে সুযোগ আর আমি তাকে দেবো না।'

সহ-সেনাপতি স্থির চোখে তাকিয়েছিল তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতির দিকে। তার কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, তিনি ঠিকই বলছেন। আইয়ুবী যত বড় সেনানায়কই হোক না কেন, তার কোন না কোন দুর্বলতা না থেকেই পারে না। হয়তো এই দিগ্বিজয়ী সেনানায়কের পরাজয় আমাদের হাতেই লেখা আছে। হয়তো তাকে অন্তিম আঘাত হানার জন্য নিয়তি আমাদেরকেই বাছাই করে রেখেছে।

সে মুজাফফরুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার দূরদর্শিতার তারিফ করার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আপনি যেমনটি ভেবেছেন তাই ঘটবে। সময় মত আপনি আমাদের প্রস্তুত পাবেন।'

মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'আজ রাতেই সৈন্যদেরকে এখান থেকে আরো দূরে কোথাও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবে। আর দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেবে নিজেদের গোয়েন্দাদের। তাদের বলে দেবে, সন্দেহজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখলেই যেন তাকে গ্রেফতার করে ধরে আমাদের গোপন

ক্যাম্পে নিয়ে আসে।'

আক্রমণের নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও সময় সম্পর্কে মুজাফফরুদ্দিন কিছুই বললো না। সহ-সেনাপতি তাকে বললো, 'আপনার ধারনাই ঠিক, সুলতান আইয়ুবী নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ বা আশংকা করেছেন। নইলে এতক্ষণে তিনি গনিমতের মাল বন্টন শুরু করে দিতেন।'

রাতে মুজাফফরুদ্দিনের নির্দেশে সৈন্যদলকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব এমন একটি জায়গা বেছে নিয়ে ক্যাম্প করলো সহ-সেনাপতি।

০

সাইফুদ্দিনের সেনাদলের ওপর সুলতান আইয়ুবীর আক্রমণ ছিল যেমন অতর্কিত ও তাদের কল্পনার অতীত, আইয়ুবীর বাহিনীর জন্যও তেমনি এক অতর্কিত ও কল্পনাতীত আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল মুজাফফরুদ্দিনের ক্যাম্পে।

সাইফুদ্দিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আইয়ুবী তার এত সতর্ক ও অতর্কিত অভিযানের খবর আগেই পেয়ে যাবে এবং তার স্বপ্ন ও আশা ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে তার বাহিনী তছনছ করে তাকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে বাধ্য করবে।

আইয়ুবীও ভাবতে পারেনি, তাঁর এত সতর্কতাকে ডিঙিয়ে মুজাফফরুদ্দিন তাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে ঝড়ের বেগে আঘাত হানতে পারে তার বাহিনীর ওপর। কিন্তু যুদ্ধ এমন এক জিনিস, যা পূর্ব নির্ধারিত ধারনা ও কল্পনাকে মুহূর্তে পাল্টে দিয়ে

নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে।

সুলতান আইয়ুবী তার সৈন্যদেরকে সাইফুদ্দিনের সম্মিলিত বাহিনীর ডান, বাম ও পিছনে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করেছিলেন যে, চতুর্মুখী আক্রমণে সাইফুদ্দিন যেন ধরাশায়ী হতে বাধ্য হয়। এ ছাড়াও তার কমাণ্ডো বাহিনীকে আশেপাশে আগে থেকেই মোতায়েন করে রেখেছিলেন, যাতে আশপাশের এলাকাতেও তাদের প্রাধান্য বজায় থাকে।

এসব কমাণ্ডো বাহিনীর কমাণ্ডার ও সৈনিকরা ছিল বিশেষভাবে বাছাই করা। তারা সবাই ছিল অসাধারণ প্রতিভাধর। বুদ্ধিমত্তা, বীরত্ব ও ক্ষীপ্রগতির জন্য এরা ছিল দুশমনের আতংক। এদেরকে এমনভাবে কমাণ্ডো ও গোয়েন্দা ট্রেনিং দেয়া হতো, যাতে তারা যে কোন ধরনের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারে।

এই গোয়েন্দা বাহিনীর প্রতিটি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ছিল নিচে চার, উপরে বারো জন। চার থেকে শুরু করে বারো জনের একেকটি ছোট্ট গ্রুপ কাজ করতো স্বাধীনভাবে। যে কোন পরিস্থিতিতে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ভোগ করতো এরা। এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দুশমনের বাহিনীর ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে শত্রু শিবিরে ত্রাস ও আতংকের সৃষ্টি করতো।

শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে এমনি একটি কমাণ্ডো দলের বারো জন সদস্য যুদ্ধের ময়দান থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিল। দফায় দফায় শত্রুদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং

এই সংঘর্ষে বারো জনের মধ্যে আট জনই শহীদ হয়ে যায়।

এই কমাণ্ডো দলের কমাণ্ডার ছিল আন নাসের। সঙ্গে তিন জন সদস্য নিয়ে আন নাসের তখনো ছুটছিল সাইফুদ্দিনের পলাতক বাহিনীর পিছনে। তার কমাণ্ডো বাহিনী তখন তুর্কমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু দূরে।

সাইফুদ্দিনের এ বাহিনীটি ছিল রসদবাহী। কমাণ্ডোদের লক্ষ্যবস্তু ছিল শত্রুদের সেই রসদপত্র। তারা সবাই ছিল অশ্বারোহী। তাদের কাছে ছিল পেট্রোল ভেজা সলতে জড়ানো তীর, তবে তা পরিমাণে খুব কম। এ ছাড়াও ছিল বর্শা, তলোয়ার ও খঞ্জর।

রসদ তখনো তাদের নাগালের অনেক দূরে। এলাকাটি মরুভূমি না হওয়ায় ধাওয়া করতে সুবিধা হচ্ছিল আন নাসেরের। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল পাহাড়ী এলাকা, টিলা ও নিম্নাঞ্চল। এলাকাটি লুকিয়ে অনুসরণ করার জন্য ছিল খুবই উপযোগী। দিনের বেলায়ও লক্ষ্যবস্তুর কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়া লুকানোর সুযোগ ছিল।

সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্যদের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য, পশুর শুকনো ঘাস, খড়, দানা, ভূষি যতটুকু সম্ভব নিয়ে পালাচ্ছিল তারা। এ ছাড়াও এদের কাছে ছিল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম, তীর, ধনুক, বর্শা ও তলোয়ার।

আন নাসের প্রথম রাতেই রসদপত্রের ওপর সফল আক্রমণ চালিয়েছিল। অনেক খাদ্যশস্য ঐ সলতে জড়ানো তীর নিক্ষেপের ফলে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

দিনের বেলা পলায়নপর বাহিনী লুকিয়ে এক জায়গায় বিশ্রাম নিচ্ছিল। আন নাসেরও তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে ছিল একটু দূরে পাহাড়ের এক গোপন গুহায়।

তারা বিশ্রাম নিলেও তাদের চোখ ছিল দুশমন কাফেলার ওপর। তারা দেখতে পেলো, শত্রু সেনারা নিম্নাঞ্চলে গর্ত, নালা ও টিলার আড়ালে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। সাথে সাথে আন নাসের তার দলের কমাণ্ডোদের নিয়ে সরে গেল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

তাদেরকে পাহাড়ের উঁচু জায়গায় ঝোপের আড়ালে এদিক-ওদিক সুবিধামত স্থানে বসিয়ে দিল। তারা ধনুকে তীর জুড়ে বসে রইল কমাণ্ডারের নির্দেশের অপেক্ষায়। শত্রু সেনারা আশপাশের নিম্নাঞ্চল ঘুরে কাউকে না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

সূর্য ডোবার পর খাদ্যশস্যবাহী কাফেলা আবার যাত্রা শুরু করলো এবং মধ্য রাতের দিকে সৈনিকদের বিশ্রাম দেয়ার জন্য আবার এক স্থানে ক্যাম্প করে সে রাতের মত আশ্রয় নিল। কিন্তু গত রাতের মত অতর্কিত আক্রমণ আসতে পারে এই ভয়ে সে রাতে পর্যাপ্ত পাহারার ব্যবস্থা রাখলো।

আন নাসের ভেবে দেখলো, আজ রাতে গুপ্ত আক্রমণ তত সহজ হবে না। শত্রুরা ক্যাম্প ছাড়াও তার আশেপাশে কঠিন পাহারার ব্যবস্থা করে রেখেছে। পদাতিক ছাড়াও এ পাহারায় অংশ নিয়েছে অশ্বারোহী বাহিনী।

এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আন নাসের একটি রাত

নষ্ট করতে চাইলো না। সে গুপ্ত হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। কারণ তার সামনে এখনও পড়ে আছে শত্রুদের বহু রসদ-সম্পদ। এ সম্পদ শত্রুরা তাদের চোখের সামনে দিয়ে ফেরত নিয়ে যাবে, তা হতে পারে না। সুলতান আইয়ুবীর নির্দেশ ও শিক্ষার কথা মনে পড়ে গেল তার। কমাণ্ডোদের কাজ বুঝিয়ে দেয়ার সময় তিনি বলতেন, 'শত্রুদের রসদপত্র ধ্বংস করা কমাণ্ডো বাহিনীর অন্যতম কাজ।'

কমাণ্ডো বাছাই ও ট্রেনিংয়ের সময় এ জন্যই তিনি এমন সব সৈন্যদের দিকে নজর দিতেন, যারা বীরত্ব, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তায় অসাধারণ! যাদের মধ্যে জাতীয় চেতনা বোধ ও ঈমানী জযবা প্রখর। এসব জানবাজ কমাণ্ডোরা দায়িত্ব পালনে এমন নিষ্ঠার পরিচয় দিত যে, বিপদসংকুল মরুভূমিতে, যেখানে কেউ সাহায্য করার নেই, সেখানেও গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবন কোরবানী করতে কুণ্ঠিত হতো না।

আন নাসের তাদের অনুসরণ করে তাদের ক্যাম্প থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিজেদের ক্যাম্প করলো। ঘোড়াগুলো গোপন জায়গায় বেঁধে রেখে সঙ্গীদের বললো, 'চলো আমার সঙ্গে।'

সে সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে গিয়ে পৌঁছলো দুশমনের ক্যাম্পের কাছে। তারপর পাহারাদারদের এড়িয়ে একটি গুপ্ত রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করলো তাদের রসদের ক্যাম্পে। সেখানে ওদের খাদ্যগুদামে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে সঙ্গীদেরকে যার যার মত পালিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। কিন্তু আগুন জ্বলার সাথে সাথেই পাহারাদাররা তৎপর হয়ে উঠলো। বেপরোয়া

তীর বর্ষণ শুরু করলো ওরা।

আন নাসের ও তার এই সঙ্গীরা তখনো এক সাথেই ছিল। তীর বর্ষণ শুরু হতেই আন নাসের ওদের বললো, 'খবরদার, দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে এখন আমরা বাঁচতে পারবো না। বাঁচতে চাইলে আমার সঙ্গে এসো।'

আন নাসের ওদের নিয়ে দুশমনের আস্তাবলের মধ্যে ঢুকে গেল। সেখানে তুলনামূলকভাবে আলো ছিল কম। তারা ঘোড়া এবং ঘোড়াগাড়ির আড়াল নিয়ে একটু একটু করে সরে এলো সেখান থেকে। এক সময় সেখান থেকে বেরিয়ে সন্তর্পনে নিজেদেরকে ছুঁড়ে দিল ক্যাম্পের বাইরে অন্ধকারের রাজ্যে।

এ যাত্রায়ও আন নাসের ও তার তিন জন সঙ্গী আল্লাহর অসীম রহমতে বেঁচে গেলো। শত্রু সেনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো চার জন।

আন নাসের আকাশের দিকে তাকালো। কিন্তু আকাশ ছিল মেঘলা, তাই সেখানে কোন তারার আলো দেখা গেল না।

রাতের তারকা কামণ্ডোদের পথ দেখিয়ে থাকে। আলোর অভাবে দিকভ্রান্ত হলো আন নাসের ও তার সঙ্গীরা। যে অন্ধকারকে একটু আগে মনে হচ্ছিল আল্লাহর রহমত, সেই অন্ধকারই হয়ে দাঁড়ালো ওদের চলার পথের প্রতিবন্ধক।

সঙ্গীরা বললো, 'আমাদের তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে ফেরা দরকার। ওরা আমাদের সন্ধানে টহল বাহিনী পাঠাতে পারে।'

আন নাসের তাদের কথার যৌক্তিকতা অনুভব করলো।

অনুভব করলো এখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা ঠিক নয়। সে বন্ধুদের বললো, 'চলো।'

আন্দাজের ওপর পথ চলছিল ওরা। আন নাসের ও তার সঙ্গীরা দীর্ঘক্ষণ পথ চলার পর অনুভব করলো, তারা পথ হারিয়েছে। যেখানে তারা ক্যাম্প করেছিল ঠিক পথে এগুলে আরো অনেক আগেই তাদের ক্যাম্পে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু আশায় আশায় বহু পথ মাড়িয়েও তারা ক্যাম্পের কোন হদিস পেল না। আন নাসের ওদের বললো, 'আমরা বোধহয় পথ হারিয়েছি।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।' বললো এক সঙ্গী।

ওরা থমকে দাঁড়ালো। পেছনে ফিরে দেখতে চেষ্টা করলো দুশমন ক্যাম্পের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা। কিন্তু তারা তখন দুশমন ক্যাম্প থেকে বহু দূর চলে এসেছিল, কোন আলোর শিখাই তাদের নজরে এলো না।

তখনও তাদের চোখে লেগে ছিল দুশমন শিবিরের রসদ ছাউনি, প্রজ্জ্বলিত আগুনের লাল শিখা ও দুশমনের তীর বৃষ্টির ঘোর। তাদের কোনই খবর ছিল না যে, তারা বেহুশের মত ছুটতে ছুটতে কোথায় চলে এসেছে।

কিছুক্ষণ তারা হতবুদ্ধি হয়ে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আবার শুরু করলো হারানো ক্যাম্পের অন্বেষণে অনিশ্চিত যাত্রা।

দিকনির্দেশনাহীনভাবে তারা সারা রাত ঘুরে মরলো। পথ

চললো শ্লথ পায়ে, অন্ধকারে গভীর দৃষ্টি ফেলে তালাশ করলো নিজেদের ক্যাম্প, দুশমনের তাঁবু। কিন্তু চার জোড়া চোখ বার বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলো। শত্রুদের ক্যাম্পের লেলিহান শিখা দূরে থাক; সে অগ্নিশিখার সামান্য লাল আভাও ওরা কোথাও দেখতে পেলো না।

হাঁটতে হাঁটতে পাহাড়ের এক টিলা থেকে আরেক টিলায় উঠে যাচ্ছিল, ঘন জঙ্গল ও ঝোপঝাড় পেছনে ফেলে ঢুকে যাচ্ছিল আরেক জঙ্গলে, কিন্তু কোন ঘোড়া বা বাহনের দেখা পাচ্ছিল না এই ক্ষুদ্র কাফেলা।

দুশমনের খাদ্যগুদামে দেয়া আগুনের সামান্য আলোর রেখাও যদি ওরা দেখতে পেতো, তবু না হয় নিজেদের ঠিকানা খুঁজে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হতো। কিন্তু তাও নেই, তাই তারা এলোমেলো পথ চলতেই থাকলো।

এক সময় পাহাড় ও জঙ্গলের সীমানা শেষ হলো। মাটির উঁচু নিচু ভাব শেষ হয়েছে, সামনে সমান্তরাল ভূমি, কিন্তু তাতে গাছপালার কোন চিহ্নমাত্র নেই।

তারা পায়ের তলে কঠিন মাটির ছোঁয়ার পরিবর্তে বালির প্রান্তর অনুভব করতে লাগলো। টিলা ও পাথরের কোন চিহ্ন নেই এখানে। বালির পথে তাদের অনিশ্চিত চলার গতি ভারী ও শিথিল হয়ে পড়লো। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় তারা পিপাসার্ত হয়ে পড়লো। অসম্ভব ক্লান্তি এসে ঘিরে ধরলো তাদের।

খাদ্য ও খাবার পানি ঘোড়ার সাথে ক্যাম্পে রয়ে গেছে। এক ফোটা খাবার পানিও সাথে নেই যে তারা পিপাসা নিবারণ

করে। ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তিতে তাদের চলার শক্তি ক্রমশ: শিথিল হয়ে এলো। চলতে না পেরে এক সময় আন নাসের থেমে গেলো। বললো, 'আর পারছি না। একটু পানি পেলে হতো!'

এটা কেবল আন নাসেরের কথা ছিল না, এটা ছিল সবারই মনের অব্যক্ত কষ্টের প্রতিধ্বনি। তারা সেখানেই বালির ওপর বসে পড়লো।

কতক্ষণ ওরা এভাবে বসেছিল বলা মুশকিল। এক সময় আন নাসেরের এক সঙ্গী বললো, 'কিন্তু আমরা কি এভাবে বসে বসে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবো? খাদ্য নেই, পানীয় নেই, এটা বাস্তবতা। কিন্তু মুজাহিদ কখনো আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয় না। আমরা মরবো, তবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচার চেষ্টা করে মরবো।'

আন নাসের ও তার সাথীরা আবার উঠে দাঁড়ালো। তারা এই আশা নিয়ে পথ চলতে লাগলো যে, সামনে কোথাও না কোথাও পানি পাওয়া যাবেই।

ওরা পথ চলছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে পানির কোন চিহ্নও ছিল না, বরং যত দূর এগুচ্ছিল ততই সে অঞ্চলকে মনে হচ্ছিল আরও কঠিন মরুভূমি।

ততক্ষণে সূর্য উঠে গেছে। ক্রমশ: সূর্য তার প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়িয়ে উপরে উঠতে লাগলো। ক্লান্ত পায়ে পথ চলতে চলতে এক সময় বসে পড়তে বাধ্য হলো ওই কাফেলা। সামনে পানির কোন নিশানাও দেখা যাচ্ছে না। মাথার ওপর উত্তপ্ত সূর্য

নিয়ে ওরা মরুভূমির সেই গনগনে বালির উপরই স্থির হয়ে বসে রইলো।

০

আন নাসের চোখ খুললো। দেখলো তার তিন সাথী বেহুশ হয়ে পড়ে আছে বালির ওপর। সূর্য দিগন্তের পাড় থেকে উপরে উঠে ছুটে যাচ্ছে গোধূলির দিকে। আন নাসের চারদিকে তাকালো। দেখলো, বালির সীমাহীন সাগরের মাঝে পড়ে আছে ওরা।

তার মন ছেয়ে যেতে লাগলো গভীর বেদনায়। সে তো মরুভূমিতেই লালিত-পালিত হয়েছে এবং মরুভূমিতে যুদ্ধও করেছে। মরুভূমিকে ভয় পাওয়ার লোক সে নয়। তার দুঃখের কারণ, সে ধারণা বা আশাও করেনি যে, হাঁটতে হাঁটতে সে তার বন্ধুদের এমন মরুভূমিতে এনে ফেলবে। দিগন্ত বিস্তৃত এই মরু এলাকায় পানির কোন চিহ্নও নেই।

পিপাসায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত, কিন্তু সে নিজেকে নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে তার সাথীদের কথা। তার বোকামীর কারণেই তার সাথীদের এখন এ করুণ অবস্থা। সে তীব্রভাবে অনুভব করলো, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে তাদের।

সে উঠে বসলো এবং সূর্যের গতিপথ দেখে অনুমান করলো, কোন দিকে তুর্কমান। সে তার সঙ্গীদের জাগালো। তারা যখন উঠলো, তখন তাদের চেহারায় ভয় ও শংকার

শিহরণ খেলা করছিল।

আন নাসের সাথীদের বললো, 'ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে বেঁচে থাকার ট্রেনিং আমরা পেয়েছি। সুলতান আমাদের এ জন্য ট্রেনিং দেননি যে, অসহায়ের মত আমরা ভাগ্যের হাতে নিজেদের সমর্পন করবো। আমরা আরও দু'চার দিন খিদে ও পিপাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আর এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা আমাদের ঠিকানায় পৌঁছতে না পারি, তবে আল্লাহ নিশ্চয়ই পানির কোন না কোন সন্ধান অবশ্যই দিয়ে দেবেন।'

আন নাসেরের কথা শেষ হলে সঙ্গী তিন জনও তাদের কথা বললো। আন নাসের তুর্কমান কোন দিকে হতে পারে সে সম্পর্কে তার ধারনা পেশ করে বললো, 'তোমাদের কি মনে হয়?'

সঙ্গীরা নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করে বললো, 'আমরা আমাদের এলাকা ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। কিন্তু এতটা দূরে নয় যে, দু'দিন চলার পরও এই মরুভূমি আমরা পার হতে পারবো না। আমাদেরকে এ মরুভূমি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে এবং এখন থেকে নতুন উদ্যমে ও আশায় বুক বেঁধে আমাদের পথ চলতে হবে।'

এক সঙ্গী বললো, 'যদি আমাদের কাছে ঘোড়া থাকতো তবে এই মুস্কিল অনেকটা আসান হয়ে যেতো। আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই কোন লোকালয়ে পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'কিন্তু যা নেই তা নিয়ে আফসোস করে লাভ নেই।' বললো অন্য জন, 'আমি এখন অনেকটা সতেজ অনুভব

করছি। মনে হয় আমরা যে কিছুটা সময় ঘুমোতে পারলাম তাতেই শরীরে এ সজীবতা ফিরে এসেছে। এটাকেও আমি আল্লাহর এক রহমত মনে করি।'

অন্যরাও তার সাথে একমত হলো।

আন নাসের বললো, 'হে সাথীরা আমার! আল্লাহ জাল্লে শানুহু আমাদেরকে যে অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছেন, সে পরীক্ষায় আমাদেরকে কোন রকম অভিযোগ ছাড়াই উত্তীর্ণ হতে হবে। এখানে চুপ করে বসে থাকলে সমস্যার কোন সমাধান হবে না।'

এক সঙ্গী বললো, 'বরং মাথার ওপর সূর্য বসে থেকে আমাদের কেবল পোড়াতেই থাকবে। অতএব আর বসে থাকা নয়, চলো যাত্রা শুরু করি। আল্লাহ চাইলে আমাদের পথ খাটো ও সহজ করে দিবেন।'

তারা যাত্রা শুরু করলো, তবে এবারও অনুমানের ওপর নির্ভর করে। পার্থক্য এটুকু, রাতে অনুমান করারও কোন মাধ্যম ছিল না, এখন অনুমান ও দিক নির্ণয় করার জন্য অন্তত সূর্য আছে।

তারা পথ চলছে। পায়ের নিচে উত্তপ্ত বালির সমুদ্র। সূর্যের তাপে সেখানে এক ধরনের তরঙ্গ উঠছে। মনে হচ্ছে বালির ওপর দিয়ে নদীর পানির মত অবিরাম ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে নেচে উঠছে হাজারটা মরীচিকা। সম্মুখে কিছু দূর থেকে যত দূর দৃষ্টি যায়, মনে হয় বালি নয়, যেন পানির তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। পায়ের নিচের মাটির উত্তাপ অসহ্য ঠেকছে,

তবু পথ চলছে ওরা।

এরা চার জনই মরুভূমির সাথে পরিচিত। মরুভূমির গজব ও বিভীষিকার সাথে অভ্যস্থ এদের জীবন। তাই যতই মরীচিকা ওদের হাতছানি দিক, ওরা তাতে ভুলবার নয়। মরুভূমির এই মরীচিকার সাথে পরিচিত বলেই তারা মরীচিকার লোভাতুর আহবান ও আকর্ষণ উপক্ষো করে চলতে লাগলো।

'হে, সাথীগণ!' আন নাসের বললো, 'আমরা ডাকাত নই। জেহাদের ময়দানে এসে আমরা এমন কোন অপরাধ করিনি, যার জন্য আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিতে পারেন। যদি আজ এই অবস্থায় আমাদের মৃত্যু হয়, আমাদের মৃত বলা যাবে না, আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী আমরা 'শহীদ' হয়ে যাবো। যে শাহাদাতের তামান্না নিয়ে আমরা এ জেহাদের ময়দানে এসেছি, যে শাহাদাতের মর্যাদা আমাদের প্রতি মুহূর্তের স্বপ্ন-সাধ ও কামনা। সে জন্যই কোন ভয়, হতাশা, নৈরাশ্য আমাদের স্পর্শও করতে পারবে না। আর, কোন মানুষকে যদি ভয় বা হতাশা স্পর্শ করতে না পারে সে কখনো দুর্বল হয় না। ক্ষুৎ-পিপাসার কাতরতা আত্মশক্তির ঐশ্বর্যের কাছে কিছুই না। নিশ্চয়ই আমাদের এই পরীক্ষায় ফেলা আল্লাহরই ইচ্ছা এবং তিনিই আমাদেরকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে পারেন। আল্লাহকে স্মরণ করো, আল্লাহর জিকির করতে করতে পথ চলো, দেখবে ক্লান্তি কমে যাবে।'

'রাস্তায় যদি কোন যাত্রীর কাছে পানি পাই, তবে তা

ছিনিয়ে নিতে দ্বিধা করবো না আমি।' বললো এক সাথী।

'ছিনিয়ে নিতে যাবে কেন, যদি আল্লাহ তাদেরকে দিয়ে আমাদের জন্য পানি পাঠানোরই ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে সে পানি আমরা কেমন করে পাবো, তার ব্যবস্থাও তিনিই করবেন।'

'একেই বলে গাছে খেজুর গোফে রুমাল। যেখানে পানির 'প'ও নাই সেখানে উনি ছিনতাইয়ের জন্য পেরেশান হয়ে উঠেছেন।' বললো অন্য জন।

তার এ কথায় সবাই একটু হাসলো। এ হাসিই যেন তাদের সবার মন আরো হালকা করে দিল। কিন্তু যদি অন্য কেউ এ হাসিটুকু দেখতে পেতো তাহলে অনুভব করতো, হাসি দেয়াটা কোন সহজ কাজ নয়, এর জন্যও লাগে প্রচুর শক্তি।

গনগনে সূর্য মাথার ওপর বসে উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সেই উত্তাপের কথা ভুলে যেতে আন নাসের যুদ্ধের সঙ্গীতের সুর গুন গুন করে গাইতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে তার সাথীরাও সেই সুরে সুর মিলালো। সঙ্গীতের সেই সুরে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা। তারা সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে চললো,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ / জানের মালিক এক আল্লাহ
তার নামে হও ফানাফিল্লাহ। / মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
তিনি নেতা নাবিয়াল্লাহ / নিপাত যাবে গায়েরুল্লাহ।'

তখন হালকা হালকা বাতাস বইতে আরম্ভ করলো। সূর্যের কিরণ বালিতে পড়ে যে চমক সৃষ্টি করছিল, বাতাসের উড়ে আসা বালিতে ঢেকে গেল সে চমক।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তের দিকে নেমে যেতে লাগলো। উত্তাপের দাবদাহ কমতে লাগলো একটু একটু করে। ক্লান্ত সূর্যের মত ওই চার মুজাহিদের পা-ও শ্রান্তিতে অবশ হয়ে আসছিল।

পশ্চিমের দিগন্তে হারিয়ে যাওয়ার মত সূর্যের একটি ঠিকানা আছে, যেখানে সে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবে একটি পুরো রাত। কিন্তু এই মুজাহিদদের বিশ্রামের মত কোন নিশ্চিত আশ্রয় ছিল না। ধীরে ধীরে অবশ পায়ে ওরা চলতেই থাকলো। কিন্তু সে চলায় ছিল ক্লান্তি ও অবসন্নতার ছাপ। ওদের ঠোঁটগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল, মুখ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের উদ্দীপনাময় গান।

তাদের ছায়া যখন পূর্ব দিকে লম্বা হতে হতে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়লো, সাথীদের মুখ থেকে হারিয়ে গেল গান, তখনও আন নাসের বিড়বিড় করে পড়ছিল,

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ / জানের মালিক এক আল্লাহ
তার নামে হও ফানাফিল্লাহ। /মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ
তিনি নেতা নাবিয়াল্লাহ / নিপাত যাবে গায়েরুল্লাহ।'

এক সময় আন নাসেরের বিড়বিড় জপমালাও বন্ধ হয়ে গেল।

আন নাসের বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'প্রিয় সাথীরা আমার! আমাদের বোধহয় এখন একটু বিশ্রামের দরকার।'

ওরা থামলো। সূর্যের শেষ লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠেছিল ওদের চেহারাগুলো। এখন আর সূর্যের সেই তেজ নেই।

অনেক সহনীয় হয়ে এসেছে বাতাস ও বালি।

সেই নরম বালির ওপর বসে পড়লো ওরা। কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। অবশেষে নিরবতা ভাঙলো আন নাসেরই, শরীরের অবশিষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে বললো, 'তোমরা নিরাশ হয়ো না, মুমীনের জীবন খাতায় নিরাশার কোন ছায়া থাকে না। হয়তো আমাদের ঈমান এখনো কমজোর। তাই আমাদের চেহারায় খেলা করছে দুশ্চিন্তার ছায়া। ঈমানকে মজবুত করো। বাঁচতে হলে আমাদেরকে ঈমানের জোরেই বাঁচতে হবে।'

সে কথা বলছিল আর সাথীদের চেহারা বার বার লক্ষ্য করছিলো। তাদের চেহারা ও মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। চোখগুলো ঢুকে গেছে ভিতরের দিকে।

সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকারে ছেয়ে গেল মরু চরাচর। বালিও ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এলো। আন নাসেরের সঙ্গীরা শুয়ে পড়লো সেই ঠাণ্ডা বালির ওপর।

আন নাসের তাদের কোন বাঁধা দিল না, বরং সেও শুয়ে পড়লো তাদের পাশে। ওরা যদি কমাণ্ডো সেনা না হয়ে কোন সাধারণ মুসাফির হতো, তবে অনেক আগেই মাটিতে পড়ে যেত। ওরা একে তো সৈনিক, তার ওপর কমাণ্ডো সেনা। সাধারণ মানুষ থেকে অনেক বেশী কষ্ট ও বিপদ সহ্য করার শক্তি ও ক্ষমতা রাখে তাদের শরীর। তাই এখনো টিকে আছে ওরা।

ঠাণ্ডা বাতাসে ওদের শরীর জুড়িয়ে গেল। গভীর ঘুমে

তলিয়ে গেল আইয়ুবীর চার কমাণ্ডো সেনা। মরু শেয়াল তাদের হামলা করতে পারে, ঘটে যেতে পারে কোন অযাচিত বিপদ, এমন কোন চিন্তাই জাগলো না ওদের মধ্যে।

০

তখনও সকাল হয়নি, তবে হতে বেশী দেরীও নেই, ঘুম ভাঙতেই আকাশের দিকে তাকিয়ে তারকারাজি দেখে অনুমান করলো আন নাসের। তারার আঁলোয় আরেকবার দিক নির্ণয় করে সে সঙ্গীদের ডেকে তুললো। বললো, 'রাত প্রায় শেষ, চলো রোদ উঠার আগেই যতদূর পারা যায় এগিয়ে থাকি।'

ওরা আবার যাত্রা শুরু করলো। সারা রাত ঘুম ও বিশ্রামের কারণে শরীর অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। চলার গতি মোটামুটি ভালই, তবে ক্ষুধা ও পিপাসার কথা কেউ মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না।

'এখানে মরুভূমি এত বিস্তৃত হতে পারে না।' আন নাসের আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বললো, 'আজ নিশ্চয়ই পানির সন্ধান পেয়ে যাবো।'

সঙ্গীরা তার এ কথার কোন জবাব দিল না। তবে দিনের বেলায় মরীচিকা দেখে পানির জন্য যত পেরেশানী ছিল, রাতের আঁধারে পেরেশানী ততটা প্রখর ছিল না। বরং আন নাসেরের মত তারাও আশা করছিল, রাত পেরোলে হয়তো কোন মরুদ্যান বা ঝর্ণা তাদের সামনে পড়ে যেতেও পারে। এ আশা নিয়েই তারা পথ চলতে লাগলো।

সকাল হলো। পূর্ব দিগন্তে দেখা দিল আলোর রেখা। রক্তিম সূর্য উদয় হলো ওদের দিকে চোখ রাঙানি দিয়ে। একটু পরই তেতে উঠতে শুরু করলো বালি। কিন্তু আশার দিক হলো, ক্রমেই বালির পরিমাণ কমে গিয়ে মাটি দেখা দিতে শুরু করলো।

এই জানবাজ কমাণ্ডোদের জন্য দিনের প্রথম দু:খ নিয়ে এলো উত্তপ্ত সূর্য। পানির আশায় আশায় জান বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো তাদের। বালি আর ছিল না, তবে মাটি ছিল খুব কঠিন। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সে মাটিতে লম্বা লম্বা ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল।

সেই সব ফাটল টপকে পথ চলতে হচ্ছিল তাদের। এতে মাঝে মাঝেই পায়ে ঠোকর খাচ্ছিল। দ্বিতীয় দুঃখ হিসাবে দেখা দিল এই পায়ে ঠোকর খাওয়া। কারণ এতে করে ক্লান্ত পাগুলো আহত হয়ে পড়ছিল।

আট দশ মাইল দূরে হঠাৎ মাটির স্তম্ভ চোখে পড়লো ওদের। এতেই ওরা উৎফুল্ল হয়ে পড়লো। কিন্তু পরে দেখা গেল, আসলে সেগুলো ছিল মাটির টিলা ও বালির ঢিবি। সেখানে কোন গাছপালা বা পানির উৎস ছিল না। মাটির অবস্থা যা তাতে মনে হচ্ছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এ মাটি পিপাসায় মরছে। এখন পানি কেন, এ মাটি মানুষের রক্ত পান করতেও আপত্তি করবে না।

আন নাসের তার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। তাঁদের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলো নিজের চেহারাটা এখন কেমন

হয়েছে। পিপাসায় তার এক সাথীর ততক্ষণে জিহ্বা বের হয়ে এসেছিল। ঠোঁটের অবস্থা ছিল আরো করুণ, শুকিয়ে তা কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বোধহয় সে ঠোঁট কিছুটা ফেটেও গিয়েছিল, কারণ একটু একটু জ্বালা করছিল ঠোঁটে।

আলামত খুব সুবিধের নয়। আর বেশী সময় এভাবে টেকা যাবে না। পানি না পেলে হয়তো মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে তাদের। এসব আলামত তারই করুণ ইঙ্গিত বহন করছে। মরুভূমি তার মাশুল নিতে শুরু করেছে। সুলতান আইয়ুবীর চার চৌকস কমাণ্ডো এখন রক্ত পিপাসু মাটির খোরাক হতে যাচ্ছে।

আন নাসের আবার তাকালো বন্ধুদের দিকে। তার দুই সৈন্যের অবস্থা এখন এতটাই নাজুক যে, তারা আর ঐ স্তম্ভ বা মাটির টিলার কাছেও পৌছতে পারবে বলে মনে হয় না।

আন নাসের নিজের দিকে মনোযোগ দিল। তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, আন নাসের, তুমি এই জানবাজ কমাণ্ডোদের কমাণ্ডার। এদের বাঁচানোর দায়িত্ব এখন তোমার। তুমি তোমার অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ করে তোল। নিজের বুদ্ধি ও বিবেককে সজাগ ও নিয়ন্ত্রণে আনো। যদিও তোমার শারীরিক অবস্থা সাথীদের তুলনায় তেমন উন্নত নয়, কিন্তু মানসিক অবস্থা তাদের মত হলে চলবে না তোমার। যদি তাই হয় তাহলে তুমি কেমন কমাণ্ডার? একই যদি হবে তোমার অবস্থা তাহলে তোমার পদমর্যাদাও হতো এক। কিন্তু সেটা যখন হয়নি, যখন সুলতান তোমাকে অর্পন করেছেন উচ্চতর মর্যাদা

ও পদবী, তখন তোমাকে তার মর্যাদা রক্ষা করতেই হবে।

আন নাসের এভাবে নিজেকে বুঝাচ্ছিল আর উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছিল সঙ্গীদের। সে তাদের পড়ে শোনাচ্ছিল আল্লাহর কালাম ও রাসূলের ত্যাগ-তিতীক্ষাপূর্ণ হাদিসগুলো। কিন্তু তাতে বন্ধুদের মনে কোন প্রভাব পড়ছে কিনা বুঝতে পারলো না। বুঝতে পারলো না, এতে কোন কাজ হচ্ছে, নাকি সবই ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

যতই সূর্য উপরে উঠতে লাগলো, মাটির তাপ ততই বাড়তে লাগলো। এই চার জন হতভাগা সৈন্যের চলার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে এলো। তারা আর পা উঠাতে পারছিল না। কোন রকমে পা টেনে টেনে তবু চলা অব্যাহত রাখলো ওরা।

যে সৈনিকটির জিহ্বা বের হয়ে পড়েছিল, তার শক্তি এতটাই নিঃশেষ হয়ে এলো যে, তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল বর্শা। পরে সে তার কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারও খুলে ফেলে দিল। সে যখন এসব করছিল তখন তার আদৌ হুশ ছিল কিনা বলা মুশকিল, কারণ তখন সে কোন কথা বলছিল না।

মরুভূমি তখন তাকে নিয়ে নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠেছে। যখন কোন পথিক এমন অবস্থায় পড়ে যায় তখন সে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে পতিত হয়। সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ঘোরে সে এমন সব কাজ করতে থাকে যার কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না।

সে তার দেহকে হালকা করার জন্য শরীরের সমস্ত কাপড় চোপর ও অস্ত্র খুলে ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করলো।

তার মনে-হলো, তার সামনে মরুভূমিতে এলোমেলো পড়ে আছে কোন দিকভ্রান্ত মুসাফিরের লাশ। সে দেখতে পেলো, হতভাগা সেই মরুযাত্রীর হাড় ক'খানা বাতাসে দুলছে। না না, ওরা তো দুলছে না, বরং হাত ইশারায় তাকে ডাকছে। সে সেই ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য তার সকল সম্বল রাস্তায় ফেলে দিয়ে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

মরুভূমি আন নাসেরের এক সাথীকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেল, যখন সে তার সব সাজ-সরঞ্জাম দুনিয়াতেই ফেলে দিয়ে তার দুনিয়ার দায়িত্ব শেষ করতে চাচ্ছিল।

আন নাসের তার সঙ্গীর বর্শা ও তলোয়ার উঠিয়ে নিল এবং তার কাঁধে হাত রেখে সঙ্গীকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, 'এত তাড়াতাড়ি জীবনে হার মানতে নেই বন্ধু! আল্লাহর সৈনিক মৃত্যুবরণ করে কিন্তু অস্ত্র ফেলে দেয় না। তোমার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এসব তোমাকে সাথে রাখতে হবে।'

সাথী তার দিকে ঘোলাটে চোখে তাকালো। আন নাসের চেয়ে রইল তার দিকে। চার চোখ মিলিত হলো পরস্পর। সহসা সে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর চোখ সরিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে, হাত দিয়ে ইশারা করে বলে উঠলো, 'পানি! ঐ দেখো বাগান, পানি পেয়ে গেছি।' সে সামনের দিকে দৌড় দিল।

সে যেদিকে হাত ইশারা করেছিল, সেখানে কোন পানি ছিল না, এমন কি পানির কোন মরীচিকাও ছিল না। কারণ ওই অঞ্চল মরুভূমি ছিল না, জায়গাটা ছিল নিরেট কঠিন মাটিতে পরিপূর্ণ। এ মাটি মরীচিকা হওয়ারও যোগ্য ছিল না। কারণ মরীচিকা সৃষ্টি হয় বালির চাকচিক্যে।

এটা ছিল তাদের ওপর মরুভূমির দ্বিতীয় নিষ্ঠুর তৎপরতা। এ ব্যাপারটা ঘটে সম্পূর্ণ কল্পনার মধ্যে। হতাশার মাঝে আশার কাল্পনিক ধারণা হঠাৎ মূর্ত হয়ে উঠে মৃত্যুপথযাত্রী মুসাফিরের মধ্যে। কল্পনা তখন বাস্তব রূপ ধরে চোখের সামনে দেখা দেয়। পানির ঝর্ণা, ফলের বাগান, অট্টালিকা সবই সে দেখতে পারে সেই কল্প-বাস্তবতার চোখে। এমনও চোখে পড়ে, যেন সামনেই আছে কোন শহর নগর। এমন কি সে ইচ্ছা করলেই দেখতে পায়, বিশাল কাফেলা এগিয়ে যাচ্ছে তার পাশ ঘেঁষে। নর্তকী ও গায়িকার দলকে দেখতে পায় নৃত্যরত অবস্থায়। মৃত্যু পথযাত্রী মুসাফিরের সামনে এমনি নির্দয়-নিষ্ঠুর খেলায় মেতে উঠে বিরান মরুভূমি।

আন নাসেরের এক সঙ্গীকে এমনি ধোঁকা দিতে আরম্ভ করলো সেই বিরাণ প্রান্তর। তার প্রাণ নিয়ে শুরু করলো মরণ খেলা। একে মরুভূমির সান্ত্বনাও বলা চলে। কোন যাত্রীর প্রাণ কেড়ে নেয়ার আগে অপূর্ব মনোরম দৃশ্য ও ছবির বহর দেখিয়ে তার মৃত্যু কষ্ট কিছুটা লাঘব করে দেয়।

আন নাসেরের সঙ্গী সামনের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো। যে সৈনিক একটু আগেও কোন রকমে পা টেনে

টেনে পথ চলছিল, সে সুস্থ্য মানুষের মত দৌড়াতে শুরু করলো। এই দৌড়ানো ঠিক প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগের অবস্থার মত। আন নাসের তার পিছনে দৌড় দিলো এবং তাকে ধরে ফেললো। তার অন্য দুই সাথীর মধ্যে প্রাণশক্তি তখনও কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তারাও দৌড়ে এসে তাকে ধরে ফেললো। সে তাদের থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'চলো, ঐ পানির ঝিলের ধারে যাই। ঐ দেখো হরিণ ও পাখি ঝিলে পানি পান করছে।'

সাথীরা তাকে ধরে পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে চলতে লাগলো। আন নাসের তার মাথার কাপড় দিয়ে তার মুখ-চোখ ঢেকে দিল যেন ধোঁকার দৃশ্য তার সামনে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

০

সূর্য মাথার ওপর উঠে এলো। তখন আর এক সিপাহীও চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, 'ঐ যে বাগানের মধ্যে নর্তকী নাচছে। ধূর, পানির আশা বাদ দাও, চলো নাচ দেখি। চলো বন্ধু সেখানে পানিও পাওয়া যাবে। ঐ যে লোকেরা আহার করছে, আমি তাদের সবাইকে চিনি, চলো, চলো।'

সেও দৌড়াতে উদ্যত হলো। প্রথম যে সৈনিকের দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল সে কিছুক্ষণ পর নীরব হয়ে গিয়েছিল। ফলে সাথীরা তাকে ছেড়ে দিয়েছিল।

সে তার সাথীকে দৌড়াতে দেখে নিজেও পিছু পিছু

দৌড়াতে শুরু করলো আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'নর্তকী খুবই সুন্দরী, তাকে আমি কায়রোতে দেখেছি। সেও আমাকে চিনে। আমি তার সাথে আহার করবো, তার সাথে সরবত পান করবো।'

এ দৃশ্য দেখে আন নাসেরের মাথাও খানিকটা এলোমেলো হয়ে গেল। সে মরুভূমির কষ্ট ও বিপদ সহ্য করতে পারে কিন্তু সাথীদের এ করুণ অবস্থা তার সহ্যের বাইরে। তাদেরকে সামাল দেয়াই এখন তার জন্য দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। তার যে সহকারী এখনো সুস্থ্য আছে, শারীরিক দিক দিয়ে সেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এমনকি তার নিজের শারীরিক অবস্থাও খুবই শোচনীয়।

তার দুই সাথী, যারা বাগানে নর্তকীর নাচ দেখার কাল্পনিক ছবি দেখে দৌড়াচ্ছিল, তারা কয়েক কদম গিয়েই পড়ে গেল। তারা তো পড়বেই। কারণ তাদের শরীরে আর আছেই বা কি। আন নাসের ও তার সাথী দু'জনকে ধরে তুলে বসালো এবং চোখ ও মাথার ওপর কাপড়ের আবরণ ফেলে দিল। তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেল, তারা বসে টলতে লাগলো।

'তোমরা আল্লাহর সৈনিক!' আন নাসের আস্তে তাদের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, 'তোমরা আল্লাহর রাসূলের অনুসারী। তোমরা ইসলামের শত্রুদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছো। তোমাদের দেখে কাফেররা ভয়ে কাঁপে। তোমরা অগ্নিশিখাকে মাড়িয়ে চলা বীর সৈনিক! এই মরুভূমি, পিপাসা, সূর্যের তাপকে তোমরা কি মনে করো? তোমাদের ওপর শীঘ্রই

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হবে। আল্লাহর ফেরেশতারা বেহেশতের ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে আনবে তোমাদের জন্য। তোমাদের শরীর তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত কিন্তু তোমার আত্মা তৃষ্ণার্ত নয়। ঈমানের উষ্ণতায় তোমাদের দীল ভরপুর। মোমিন জিন্দা থাকে তার এই ঈমানকে সম্বল করে।'

দু'জন সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর থেকে ফেলে দিল কাপড়ের আচ্ছাদন। পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ওরা আন নাসেরকে দেখলো। আন নাসের একটু হাসতে চেষ্টা করলো। সে আবেগের আতিশয্যে যে কথাগুলো বলেছিল সে কথা ওদের মনে এমন প্রভাব ফেলবে ভাবতে পারেনি আন নাসের। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর দু'জন সৈনিকই কল্প-বাস্তবতার পথ ত্যাগ করে বাস্তব জগতে ফিরে এলো। তারা সজোরে আন নাসেরের হাত আকড়ে ধরে বললো, 'আমরা কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?'

আন নাসের বললো, 'না, একটু তন্দ্রার ঘোর লেগেছিল। ও কিছু নয়, চলো, এখনো অনেক পথ বাকী।'

তারা উঠে দাঁড়ালো এবং ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো।

ওরা টিলা ও বালির যে স্তম্ভ দেখেছিল অনেক আগে, তার কাছাকাছি এসে গেল। এখন সেগুলো অনেক বড় বড় দেখা যাচ্ছে। তারা আশা করলো, সেখানে আর কিছু না হোক, অন্তত পানি পাওয়া যাবে। সেখানে নিম্নাঞ্চল আছে, সেই নিম্নাঞ্চলে নিশ্চয়ই পানির নালা ও ঝর্ণা থাকবে।

আন নাসের তাদের বুঝালো, 'আমরা পানির কাছাকাছি এসে গেছি, আজ সন্ধ্যার আগেই ইনশাআল্লাহ পানি পাওয়া

যাবে।’

তারা সেই প্রান্তরে এসে পা রাখলো। কিন্তু এখানকার মাটি এত শুকনো ও কঠিন যে, এখানে পানির আশা শিশির কণার মত বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। তারা মাটির টিলা ও ঢিবির ওপর বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সহসা এক সিপাই দৌড় দিল ও চিৎকার করে বলতে লাগলো, ‘আমরা গ্রামে এসে গেছি! আমি সবার জন্য খানা পাকাতে যাচ্ছি। ওই দেখো কূপ থেকে আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা পানি উঠাচ্ছে।’

তার পিছনে দ্বিতীয় সৈনিকও দৌড়ালো এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, ‘ঐ যে হংস মিথুন।’

তারা দৌড়াতে দৌড়াতে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে মুষ্টি ভরে মাটি ও বালি মুখে পুরে নিল।

আন নাসের ও তার অপর সঙ্গী দৌড়ে তাদের কাছে গেল। তাদের মুখ থেকে মাটি বের করে কাপড় দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে তাদের দু’জনকেই তুলে বসালো। কিন্তু তাদের আর চলার শক্তি ছিল না। তখনো এক সৈনিক বলছিল, ‘কূপ থেকে আগে পানি পান করি, তারপর তোমাদের জন্য রান্না চড়াবো।’

আন নাসের দোয়ার জন্য হাত উঠালো। আকাশের দিকে দু’হাত উঠিয়ে বললো, ‘আয় আল্লাহ জাল্লে জালাল! আমরা তোমার নামের ওপর লড়তে ও মরতে এসেছি। আমরা কোন পাপ করিনি, কোন চুরি-ডাকাতিও করিনি। যদি কাফেরদের

সাথে যুদ্ধ করা আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে, তবে আমাদের ক্ষমা করে দাও। হে মরুভূমি ও এই অসহনীয় পরিবেশের মালিক! হে আমাদের দয়ালু খোদা! তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। তুমি আমার প্রাণ নিতে চাও, নিয়ে নাও। তাতে আমার কোন আফসোস নেই। শুধু তোমার রহমতের কাছে আমার প্রার্থনা, তুমি আমার রক্তকে পানি বানিয়ে দাও, যাতে আমি আমার মুমূর্ষূ সাথীদেরকে তা পান করাতে পারি। এরাইতো তোমার প্রথম কেবলাগ্রাসকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তুমি আমার রক্তকে পানি বানিয়ে এদেরকে পান করিয়ে দাও খোদা।'

মোনাজাত শেষ করে সে তার সঙ্গীদের দিকে ফিরলো। সঙ্গীরা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো এবং চলতে লাগলো।

আন নাসের তার সাথীদেরকে দেখলো এবং পা টেনে টেনে চলতে লাগলো ওদের সাথে।

এ সময় আন নাসেরের চোখের সামনে অন্ধকার নেমে এলো। বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না এ অন্ধকার, সহসাই সেখানে যেন আলোর নাচন শুরু হলো। চাঁদকে মুক্ত করে কালো মেঘ সহসা সরে গেল যেমনটি হয় অনেকটা সে রকম। অন্ধকার দূর হওয়ার সাথে সাথে তার মনে হলো, যেন সামনে সবুজ শস্য ক্ষেত। কিন্তু তার সামনে আসলে বালির টিলা ও পাথরের স্তম্ভ ছাড়া আর কিছু ছিল না। সে এক মুহূর্তের জন্য সবুজ মাঠ দেখলো, সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ বন্ধ করে ফেললো। সে বুঝতে পারলো, মরুভূমি তাকেও ধোঁকা দিতে শুরু করেছে।

তারা এক টিলার মাঝ দিয়ে যাচ্ছিল। টিলাটি ছিল বেশ প্রশস্ত। কোথাও কোথাও বালির মাঝে পাথরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। তারা একটু সামনে অগ্রসর হলো, তখন তাদের সামনে পড়লো একটি মরা নদীর শুকনো পাড়। স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে, এখানে পানির চিহ্ন ছিল, তবে তা কত শত বছর আগে, তা বলা মুশকিল।

আন নাসের আগে ও তার সাথীরা পিছনে তাকে অনুসরণ করছিল। আন নাসের চলতে চলতে থেমে গেল। সে তার মাথাকে জোরে ঝাঁকি দিয়ে সামনে তাকালো। সে পূর্বে যা দেখেছিল, তাই দেখতে পেল। শুকনো নদীর অপর তীরে বালির পাহাড়। সে পাহাড় উপরে উঠে আবার ঝুঁকে গেছে উল্টো দিকে। সম্ভবত বহু শতাব্দী আগে এর তলদেশ দিয়ে পানি প্রবাহিত হতো। এখনও তার সেই আকৃতি বহাল আছে। পাহাড়ের একাংশ ঝুঁকে আছে নিচের দিকে, তার নিচে ঘন ছায়া।

আন নাসের দেখতে পেল, সেই পাড়ের ছায়ায় দুটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। আর তার কাছেই দুই যুবতী বসে আছে। তাদের গায়ের রং ধবধবে ফর্সা, চেহারাও কোমল ও আকর্ষণীয়। আন নাসের ভাবলো, আবার সে মরুভূমির হেলোসিনেশনে পড়েছে। সে আবারও চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো এবং চোখ খুলে তাকালো সেদিকে। না, সে ভুল দেখছে না। তার ইন্দ্রিয়ও প্রতারণা করছে না তাকে।

আন নাসের দূর থেকে দেখছিল তাদের। সে পাশ ফিরে তাকালো, সঙ্গীরা ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তারাও সামনের দিকেই তাকিয়ে আছে। সে সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরাও কি আমার মতো সামনের ছায়ায় দু'টি ঘোড়া ও দু'জন মেয়েকে দেখতে পাচ্ছো?'

মানসিক ভারসাম্যহীন তার দুই সাথী নীরব থাকলো, কথা বললো না। অন্যজন বললো, 'হ্যাঁ, আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি, দু'টি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, তার পাশে বসে আছে দুই যুবতী।'

'আল্লাহ আমাদের ওপর রহম করুন!' আন নাসের বললো, 'আমাদের দু'জনেরও কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! আমরাও কি সেই ভৌতিক দৃশ্য দেখতে শুরু করেছি, যা সত্য নয়! নইলে এই বিরান জাহান্নামে, এমন নিস্তব্ধ নির্জন প্রান্তরে এত সুন্দরী মেয়ে আসবে কোত্থেকে?'

'তাদের পোষাক যদি মরুভূমির বেদুইনদের মত হতো, তবু না হয় ভাবতাম, এটা কোন ভৌতিক কাণ্ড নয়!' তার সাথী বললো, 'কিন্তু এমন নাগরিক পোষাক পরা মেয়ে এখানে আসতেই পারে না। তোমার ধারনাই বোধহয় ঠিক, আমরাও মানসিক দু:স্বপ্নের কবলে পড়ে গেছি। চলো এক কাজ করি, সামনের ছায়ায় গিয়ে বসি। হয়তো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলে আমাদের এ ভ্রান্তি কেটে যাবে।'

'কিন্তু আমি তো স্বাভাবিক অবস্থায় আছি।' আন নাসের বললো, 'আমি তোমাকে চিনতে পারছি, তোমার কথাও আমি বুঝতে পারছি। আমার মাথা এখনও আমার নিয়ন্ত্রণেই

রয়েছে!'

'আমিও তো সজ্ঞানেই আছি!' তার সাথী বললো, 'আমি তো আসলে মেয়েই দেখছি, পরীর মত সুন্দরী দুই মেয়ে!'

হঠাৎ কি মনে হতে একটি মেয়ে মুখ উপরে তুললো, সাথে সাথে তার নজরে পড়ে গেল কয়েকটি মনুষ্য মূর্তি। সে সঙ্গের মেয়েটিকে কিছু বললো, তারপর দু'জনেই তাকালো তাদের দিকে।

মেয়েরা তাদেরকে দেখে এতটাই বিস্মিত হলো যে, তারাও বাকশক্তি হারিয়ে ফেললো। মনে হলো, তারাও অনড় অনুভূতিহীন পাথর হয়ে গেছে। তারা অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা অনড় মনুষ্য মূর্তিগুলোর দিকে।

আন নাসের ভীরু বা কাপুরুষ ছিল না। জ্বীন-ভূত যাই হোক, সে তাদের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সে বিস্ময় কাটিয়ে নিজের মধ্যে একটা সপ্রতিভ ভাব ফিরিয়ে আনলো। তারপর বীরের মতই ধীর অথচ দৃঢ় পায়ে তাদের দিকে অগ্রসর হলো।

এ দেখেও মেয়ে দু'টির মধ্যে তেমন কোন ভাবান্তর এলো না। তারা তাদের জায়গায় তেমনি অনড় হয়ে বসে রইলো। পালিয়ে যাওয়ার বা রুখে দাঁড়াবার কোন চেষ্টাই তাদের মধ্যে দেখা গেল না।

আন নাসের ও তার সঙ্গীরা তাদের থেকে আর মাত্র চার পাঁচ গজ দূরে, এমন সময় একটি মেয়ে তার ডান হাত সামনে

বাড়িয়ে আন নাসেরের দিকে তাক করলো এবং তাদেরকে ওখানেই থেমে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো।

আন নাসের ও তার সঙ্গীরা থেমে গেল। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সেই রূপসীদের দিকে। এমন সুন্দরী মেয়ে তারা জীবনেও দেখেনি। মেয়েদের মাথায় রঙিন ওড়না। ওড়নার পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়ে আছে রেশমের মত কোমল চুলের গুচ্ছ। চোখের তারায় আশ্চর্য মোহিনী আকর্ষণ। সেই চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলো চার কমাণ্ডো সেনা।

'দেখেই বুঝতে পারছি তোমরা সৈনিক!' ওদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যে বড় সে বললো, 'তোমরা কার সৈনিক?'

'সব কথাই বলবো।' আন নাসের বললো, 'আগে আমাকে বলো, তোমরা মরুভূমির ধোঁকা, নাকি পরীস্থানের পরী।'

'আমরা যা কিছুই হই না কেন, আগে বলো, তোমরা কে, আর কোনদিক থেকে এসেছো?' মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

অন্য মেয়েটি বললো, 'আমরা মরুভূমির ধোঁকাও নই, পরীস্থানের পরীও নই। তোমরা আমাদের যেমন দেখছো আমরা ঠিক তেমনটিই। আমরা তোমাদের দেখে যেমন বুঝতে পারছি. তোমরা সৈনিক, চোখ থাকলে তোমরাও নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমরা দুই নারী ছাড়া আর কিছু নই।'

'আমরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইবীর কমাণ্ডো সৈনিক।' আন নাসের বললো, 'আমরা রাস্তা ভুলে এদিকে চলে এসেছি। যদি তোমরা জ্বীন জাতির হও, তবে হযরত সোলায়মানের

কসম! দয়া করে আমার এই সাথীদের পানি পান করাও, বিনিময়ে ইচ্ছে করলে আমার জান নিয়ে নিও। এরা আমার অধীনের সৈনিক, এদের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।'

'তোমার সব কথাই আমি শুনতে রাজি, তবে সবার আগে তোমাদের অস্ত্র ত্যাগ করতে। অস্ত্রের মুখে কোন শর্ত মানাকে আমি অপমানজনক মনে করি।' মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে বললো, 'হযরত সোলায়মানের কসম দিয়ে চাওয়া জিনিস তুমি পাবে। তোমার সঙ্গীদেরকে আগে ছায়ায় নিয়ে এসো।'

আন নাসেরের অস্তিত্বে জীবনের নতুন স্রোত বয়ে গেল। সে অনুভব করলো, এই স্রোত তার মাথা দিয়ে প্রবেশ করে পায়ের তলা দিয়ে বের হয়ে গেল। এই স্রোতের অনুভব অন্যরকম। সে মানুষের সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে, রাতের অতর্কিত আক্রমণে সে বরাবর সঙ্গীদের চমক লাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোন জ্বীনের সঙ্গে লড়াই করার ট্রেনিং বা অভিজ্ঞতা তার নেই। তার মনে হলো, এরা বাস্তব দুনিয়ার কোন মানুষ নয়। আর এ কথা মনে হতেই সে এই দুই অবলা নারীর কাছে নিজেকে খুব অসহায় অনুভব করতে লাগলো। তার অন্তরে এমন ভয় ঢুকে গেল যে, সে কাপুরুষের মত এই দুই মেয়ের কাছে আত্মসমর্পন করবে কিনা ভাবতে লাগলো।

সে জ্বীন-পরীদের বহু গল্প শুনেছে, কিন্তু নিজে কোন জ্বীন বা পরীর সামনে কোনদিন পড়েনি। তার ভয় হলো, যদি মেয়ে দু'টি বা তাদের ঘোড়া এখন চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়! অথবা তারা যদি আকৃতি পরিবর্তন করে ফেলে! এমন

হলে তো তার কিছুই করার থাকবে না। সে অসহায় ও নিরুপায় ভঙ্গিতে তার সাথীদের বললো, 'তোমরা ছায়ায় চলো।'

তার এক সাথী তখন বেহুশের মত পড়েছিল মাটিতে। অন্য সাথীরা তাকে ধরাধরি করে টেনে ছায়াতে নিয়ে গেল।

ওরা ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার পর অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েটি বললো, 'এবার আমাদের বলো, তোমরা কি করে এখানে এসেছো?'

'আগে পানি পান করাও!' আন নাসের অনুরোধ করলো, 'শুনেছি, জ্বীন-পরীরা সব জিনিস সবখানে উপস্থিত করতে পারে।'

'ঘোড়ার সাথে পানির মশক আছে, একটা খুলে নাও।' মেয়েটি বললো।

আন নাসের নিজেই এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ার জ্বীনের সাথে বাঁধা মশক খুলে আনলো। মশকটি পানিতে পূর্ণ। সে প্রথমে বেহুশ সাথীর ওপর ঝুঁকে পড়ে তার মুখে পানির ফোটা ঢেলে দিল। কয়েক ফোটা মুখে যেতেই সে চোখ খুললো। তার ওপর কমাণ্ডারকে ঝুঁকে থাকতে দেখে নিজে থেকেই উঠে বসলো। আন নাসের তার মুখে মশক চেপে ধরলো।

কয়েক ঢোক পান করার পর আন নাসের তার মুখ থেকে সেই মশক একরকম কেড়েই নিয়ে নিল। ও চাচ্ছিল, সে পেট ভরে পানি পান করবে, কিন্তু আন নাসের তাকে বেশী পানি পান করতে দিল না।

তার পানি খাওয়া হয়ে গেলে একে একে সবাই পানি পান করলো। আন নাসের ও তার সাথীদের ক্লান্তি ও অবসাদ তাতে অনেকটাই দূর হয়ে গেল। তখন তাদের চিন্তা শক্তি নতুন করে সচল হয়ে উঠতে লাগলো।

আন নাসের ভেবে দেখলো, এই নারীরা যদি কাল্পনিক কিছু হতো তবে এই সজীবতা ফিরে পাবার পর তাদের আর দেখা যাওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মেয়েরাতো এখনও বর্তমান, সে সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এবং নিজ চোখেই তাদের দেখতে পাচ্ছে। তার চেয়ে বেশী বাস্তব হলো, তারা পানি পান করতে দিয়েছে। আর এ পানি যদি কাল্পনিকই হতো, তবে শরীরে সজীবতা ফিরে আসতো না। সে মেয়েদের দিকে আর একবার গভীর দৃষ্টিতে তাকালো। তখন মেয়ে দু'টিকে আরও সুন্দরী ও আকর্ষণীয় মনে হলো তার কাছে। সেদিকে তাকিয়েই তার আবার মনে হলো, এরা সত্যি মানুষ নয়, কারণ মানুষ এতো সুন্দর হতে পারে না।

এই যখন আন নাসেরের মানসিক ও শারীরিক অবস্থা তখন আবার সে নিজেকে খুব দুর্বল ও অসহায় অনুভব করলো। নিজেকে তার এতটাই হীনবল মনে হচ্ছিল যে, নিজের উপর থেকে নিজেই আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিল। সে অনুভব করছিল, তার বুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে, সে আর সুস্থ মাথায় চিন্তা করারও যোগ্য নেই।

পানি পান করার কারণে তার সাথীদের চেহারায়ও জীবন ফিরে এসেছিল। মেয়েদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সে

সাথীদের দিকে তাকালো। কয়েক ফোটা পানির কি অপূর্ব মহিমা তাই দেখে বিস্মিত হলো সে। পানিটুকু যেন তাদের শরীরের প্রতিটি কোষে ও শিরায় শিরায় অনুপ্রবেশ করে তাদেরকে জীবন্ত করে তুলেছে।

আন নাসেরের মত তার সাথীদের মনেও ভয় সঞ্চারিত হয়েছিল। তারাও ভাবছিল, এরা কি মানুষ, না জ্বীন!

মেয়ে দুটিও তাদেরকে দেখছিল প্রস্ফুটিত নীরব দু'চোখ মেলে। বাইরের দুনিয়া তখন জ্বলছে মরু সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপে। মাটি জ্বলন্ত কয়লার মত উত্তপ্ত হয়েছিল, কিন্তু ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল পাহাড়ের সেই ছায়াঘন জায়গাটি ছিল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও উত্তাপের ভয়াবহ তাপ মুক্ত।

এক মেয়ে আন নাসেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাত তুলে ঘোড়া দু'টি দেখালো। বললো, 'ঘোড়ার সাথে বাঁধা থলি খুলে নিয়ে এসো এবং তোমার সাথীদের তা থেকে কিছু খেতে দাও।'

আন নাসের ভয়ে ভয়ে ঘোড়ার জ্বীনের সাথে বাঁধা ব্যাগটা খুলে আনলো, যেন ঐ থলিটা কোন যাদুর ব্যাগ।

সে যখন ব্যাগটা খুললো, তখন দেখলো তার মধ্যে খেজুর ছাড়াও খাবারের আরও কিছু জিনিস আছে, যেসব কেবল ধনী লোকেরাই খায়। এ ছাড়াও তাতে ছিল উপাদেয় শুকনো গোস্ত।

সে মেয়েদের দিকে তাকালো। বড় মেয়েটি বললো, 'খেয়ে নাও।'

আন নাসের এসব খাবার তার সঙ্গীদের মধ্যে ভাগ করে দিল। ওদের সবার পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল। তারা খাওয়া শুরু করলো। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ তাদের সে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। বড়জোর দু'জন স্বাভাবিক মানুষের একবেলার আহার হতে পারে। ওরা বিসমিল্লাহ বলে তাই খেতে শুরু করলো এবং আল্লাহর রহমে সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া শেষ করলো।

এই সামান্য খাবার তাদেরকে যেন মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনলো। নতুন করে তারা দেহে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করলো।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলো এবং আশপাশে চারদিকে তাকিয়ে এলাকাটা দেখতে লাগলো। মেয়েদের দিকে চোখ পড়তেই তারা অনুভব করলো, কিছুক্ষণ আগেও তাদের দুর্বল চোখ যা দেখেছে, তা মোটেও ভুল নয়। যদিও এখন তাদেরকে আগের চেয়েও আকর্ষণীয় ও সুন্দরী মনে হচ্ছে।

'তোমরা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?' আন নাসের মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললো, 'জ্বীন ও মানুষের সাথে কোন প্রতিযোগিতা হয় না, তোমরা আগুন! আর আমরা মাটি ও পানি। কিন্তু আমাদের সবার স্রষ্টা এক আল্লাহ! আমাদেরকে তোমাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি হিসেবে একটু দয়া করো। আমাদেরকে তুর্কমান এলাকার রাস্তাতে দিয়ে এসো। তোমরা ইচ্ছা করলে চোখের পলকে আমাদের তুর্কমান পৌঁছে

দিতে পারো।'

'তোমরা কি কোন নৈশ আক্রমণ চালাতে গিয়েছিলে?' বড় মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো। সঙ্গে সঙ্গে আরো বললো, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডোরাও জ্বীনের মতই। আমাদেরকে বলো, তোমরা কোথায় গিয়েছিলে ও কি করে এসেছো?'

আন নাসের সমস্ত ঘটনা বিস্তারিত তাদেরকে খুলে বললো। তার দল যে সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে রাতের আক্রমণ চালিয়েছিল তার পূর্ণ বর্ণনা দিয়ে বললো, 'আমরা তাদের বিপুল ক্ষতি সাধন করেছি। কিন্তু ফেরার পথে রাতের আঁধারে পথ হারিয়ে সারা রাত ঘুরে সকালে নিজেদেরকে আবিষ্কার করি মরুভূমিতে। আমাদের সাথে কোন খাবার বা পানি ছিল না, গত দুই দিন এই মরুভূমিতে টিকে আছি কেবল ঈমানের জোরে, নইলে অনেক আগেই আমাদের মরণের পরপারে পাড়ি জমাবার কথা ছিল।'

'তোমরা যে সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছো তা সত্যি বিস্ময়কর।' মেয়েটি বললো, 'তোমাদের সব সৈন্যই কি এমন দুঃসাহসী ও বীর?'

'হ্যাঁ।' আন নাসের উত্তর দিল, 'আমাদের সব সৈন্যই ঈমানের শক্তিতে আমাদের মতই বলীয়ান। তবে আমাদের চার জনকে এমন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা সব সৈনিককে দেয়া হয় না। দুঃখ কষ্ট ও বিপদ মুসীবত সহ্য করার যে ট্রেনিং আমাদের দেয়া হয়েছে, কেবল বাছাই করা কমাণ্ডোরাই সে

ট্রেনিং পায়। আমরা মরুভূমির হরিণের মত দৌড়াতে পারি, ঈগল পাখির মত আমরা বহু দূর পর্যন্ত দেখতে পারি এবং আমরা চিতা বাঘের মত আক্রমণ চালাতে পারি। আমাদের মধ্যে কেউ চিতা দেখেনি, কিন্তু চিতা কি জীব আমরা তা জানি! তারা কেমন করে হামলা করে, কেমন তাদের শারীরিক শক্তি ও তেজ, সবই আমাদের জানা।

অন্য সৈনিকরা যুদ্ধ করে সেনাপতির নির্দেশ মত, কিন্তু আমাদের যুদ্ধ করতে হয় আমাদের নিজস্ব জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অন্য সৈনিকদের তুলনায় আমরা একটু অন্যরকম। আমরা দ্রুত চিন্তা করতে পারি। আমাদের ওস্তাদরা আমাদের শিখিয়েছে কি করে দ্রুত চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় তার কৌশল। শিখিয়েছে কি করে শত্রু এলাকায় গিয়ে সেখানকার ফৌজের সাথে মিশে যেতে হয়। আমরা পোষাক বদলে ফেলতে পারি, কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করতে পারি, পারি নিজের চেহারা সুরত পাল্টে ফেলতে। আমরা অন্ধ ও বধির সাজতে পারি। প্রয়োজন হলে আমরা অশ্রু বিসর্জন করতে পারি। আর ধরা পড়ার আশংকা থাকলে আমরা আত্মগোপন করতে পারি, প্রয়োজনে দ্বিধাহীন চিত্তে জীবনের আশা ত্যাগ করে যুদ্ধ করতে পারি। আমরা অকাতরে শত্রু নিধন করতে পারি এবং হাসতে হাসতে মরতে পারি। আমরা শুধু একটি কাজ পারি না, আর তা হলো, আমরা কখনও বন্দীত্ব বরণ করতে পারি না, হয় সফল হই নতুবা শাহাদাত বরণ করে পৌঁছে যাই আল্লাহর দরবারে।'

'আমরা যদি জ্বীন না হয়ে মানুষ হতাম, তবে তোমরা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

'তুমি হয়তো সে কথা বিশ্বাস করবে না।'

'তবু বলো।'

আন নাসের বললো, 'আমরা এমন পাথর, যে পাথরকে নারীর রূপ যৌবন দ্বারা ভাঙা যায় না। আমরা যদি জানতে পারি, তোমরা মানুষ এবং তোমরা আমাদের মতই পথ হারিয়ে এদিকে চলে এসেছো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদেরকে আমাদের আশ্রয়ে নিয়ে নেবো। যতক্ষণ তোমরা আমাদের জিম্মায় থাকবে ততক্ষণ তোমাদের জান-মাল ও ইজ্জতের মুহাফেজ থাকবো আমরা। এ জন্য আমরা জীবনের ঝুঁকি নিতেও পিছপা হবো না। আমাদের ঈমান যেমন মূল্যবান আমাদের কাছে তেমনি মূল্যবান তোমাদের জীবন ও ইজ্জত। অতএব তোমাদের জীবন ও ইজ্জত রক্ষার জন্য আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়াই করবো।

কিন্তু এসব বলে কি লাভ! তোমরা তো আর মানুষ নও। তোমাদের অবস্থা ও শঙ্কাহীন চেহারাই বলে দিচ্ছে, তোমরা মনুষ্য সমাজের কেউ নও। তোমাদের মত এমন অনিন্দ্য রূপসীরা কোনদিন এই মাটির পৃথিবীর বাসিন্দা হতে পারে না।

'যদি এটাই তোমাদের বিশ্বাস হয় তবে বলো, এখন আমরা তোমাদের জন্য কি করতে পারি। আমাদের কাছ থেকে কতটুকু কি আশা করো তোমরা?'

'আমরা তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, আমাদেরকে তোমাদের হেফাজতে নিয়ে নাও এবং আমাদেরকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।'

'তুমি ঠিকই অনুমান করেছো। আমরা মানব সমাজের কেউ নই।' মেয়েটি বললো, 'আমরা জানতাম তোমরা কি করছো। তোমরা যে রাস্তা হারিয়ে বিভ্রান্ত পথিকের মত মরুভূমির গভীর বিস্তারে ধুকে ধুকে ফিরছো, আমরা সবই তা লক্ষ্য করছিলাম। তোমরা যদি গোনাহগার হতে তবে যে মরুভূমি তোমরা অতিক্রম করে এসেছো, সে মরুভূমি অতিক্রম করে এখানে আসার সাধ্য তোমাদের হতো না। তার আগেই মরুভূমি তোমাদের রক্ত পান করে, তোমাদের মাংস ও হাড্ডি শুটকি বানিয়ে বালির মধ্যে তোমাদের পুতে রাখতো। এই মরুভূমি কখনও পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করে না।

তোমাদের অবস্থা দেখে আমরা দু'জনই তোমাদের অনুসরণ করছিলাম। সারাক্ষণ আমরা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। তোমাদের যে সব কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা তোমাদের ওপর এ জন্যই চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা আল্লাহকে ভুলে না যাও, আর তোমাদের মন থেকে পাপ চিন্তা দূর হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ তোমাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। আল্লাহর শোকর. সে পরীক্ষায় তোমরা সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হয়েছো।

তোমাদের কষ্ট দেখে যখন বুঝলাম. তোমরা ধৈর্যের শেষ পরীক্ষা দিচ্ছো তখন আমরা তোমাদের সামনে মনুষ্যরূপে

আবির্ভুত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু তখন আমাদের মনে একটা ভয় কাজ করছিল, আমরা ভাবছিলাম, আমাদের হুর-পরীর মত চেহারা দেখে যদি তোমাদের সংযম ভেঙে যায়? যদি তোমরা সর্বশেষ পরীক্ষার মুখোমুখি হয়ে ভুলে যাও তোমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা! যদি শয়তানের আছর পড়ে তোমাদের ওপর আর তার প্রভাবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাও! কিন্তু আল্লাহ মেহেরবান, তিনি তোমাদের এ ধ্বংস হওয়া থেকেও রক্ষা করেছেন।'

আন নাসের ও তার সঙ্গীরা মেয়েটির কথা শুনে খুব অবাক হলো। বিস্ময় নিয়ে আন নাসের জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে তোমরা এতক্ষণ আমাদের সাথেই ছিলে? কিন্তু......'

'হ্যাঁ, দীর্ঘক্ষণ ধরে আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমাদেরকে তিনিই পাঠিয়েছেন, যিনি মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলা নেক বান্দাদের পথ দেখান।' বড় মেয়েটি বললো, 'তোমাদের ওপর আল্লাহ যে অপরিসীম রহমত বর্ষণ করেছেন, সে রহমতের পরিমাণ তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। পুরুষ মানুষ মুমূর্ষু অবস্থায়ও শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। এমন অপবিত্র অবস্থা থেমে মুক্ত করার জন্য আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তিতে ফেলেছিলেন। পরীক্ষায় পাশ করার পর আমাদের ওপর আদেশ হলো. ওদের সামনে দেখা দিয়ে অভয় ও আশ্রয় দাও। আমরা জনতাম, তোমরা শয়তানদের কি বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছো।'

'তবে কেন আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে?' আন নাসের

প্রশ্ন করলো।

'আমরা শুধু দেখতে চাইলাম, তোমরা মিথ্যা বলো কি না!' মেয়েটি বললো, 'দেখলাম, তোমরা সত্যি কথাই বলছো।'

'আমরা কখনো মিথ্যা বলি না।' আন নাসের বললো, 'আইয়ুবীর বাহিনীর প্রতিটি সেনা নিজেকে মনে করে আল্লাহর সৈনিক। আমরা যারা কমাণ্ডো সৈনিক, যারা রাতের আঁধারে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি দুশমনের ওপর, আমাদের একমাত্র ভরসা থাকে আল্লাহর ওপর। তাঁকেই আমরা আমাদের মোহাফেজ ও রক্ষাকর্তা মনে করি। আমরা আমাদের বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, সেনাপতির নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়ে একমাত্র এই শক্তিবলেই জীবনের মায়াকে তুচ্ছজ্ঞান করি। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের সর্বক্ষণ দেখছেন ও দেখবেন। আমরা যেহেতু আল্লাহর দৃষ্টির বাইরে যেতে পারবো না তাই তার নাফরমানিরও কোন প্রশ্ন আসে না। এই বিশ্বাস ও শক্তিই আমাদেরকে সব পাপাচার থেকে রক্ষা করে।'

আন নাসের চুপ করলো। মেয়েরাও চুপ। একটু পর নীরবতা ভঙ্গ করলো আন নাসেরই, প্রশ্ন করলো, 'তোমরা তো আমার এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলে না যে, তোমরা আমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?'

'আমাদের যে আদেশ করা হয়েছে, তার ব্যতিক্রম কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই।' মেয়েটি উত্তর দিল, 'তোমরা আশ্বস্ত থাকতে পারো, আমরা তোমাদের সাথে কোন খারাপ

ব্যবহার করবো না। আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা কথা বলতে পারছো না। তুমি ও তোমার সঙ্গীদের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে ঘুমে। কিন্তু ভয়ের কারণে তোমরা ঘুমাতে পারছো না। অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর করে দাও। এখন প্রশান্ত মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।'

'তারপরে কি হবে?' আন নাসের জানতে চাইলো।

'যা আল্লাহর আদেশ হবে, তাই!' মেয়েটি উত্তরে বললো, 'তবে আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু যদি আমাদের এ আশ্বাসে আশ্বস্ত না হয়ে পালাতে চেষ্টা করো তবে ঐ বালির খুঁটি বা স্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে থাকবে অনন্তকাল ধরে।' এই বলে সে অদূরে দণ্ডায়মান কতগুলো বালির স্তম্ভের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললো, 'তোমরা তো দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছো ওই বালির স্তম্ভগুলো। এগুলোর ওপর যুগ যুগ ধরে কোন চালা নেই, তবু ওরা টিকে আছে পাপের সাক্ষী হয়ে। দেখতে ওগুলো স্তম্ভ বা ঢিবির মত দেখা গেলেও, আসলে এগুলো মানুষ! তোমাদেরকে দেখানোর কোন আদেশ নেই, যদি আদেশ থাকতো তবে যে কোন স্তম্ভের ওপর তলোয়ারের আঘাত করলে তোমরা দেখতে পেতে, তা থেকে রক্ত ঝরছে।'

আন নাসের ও তার সাথীদের ভয় আরও তীব্র হলো. ভীতিবিহ্বল চোখে তারা তাকিয়ে রইলো সেই স্তম্ভগুলোর দিকে। তাদের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝবে. মেয়েটির কথা তারা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছে, যার কারণে তারা দম আটকে

বসে আছে।

'এই মরুভূমিকে বলতে পারো মাটির জাহান্নাম।' মেয়েটি আবার বলতে শুরু করলো, 'সাধারণত পথ ভুলে এদিকে যারা আসে, তাদের পরিণতি হয় খুবই করুণ। তারা হয়ে যায় বিপথগামী ও পাপী। বিভ্রান্ত মুসাফিরকে পথ দেখানোর জন্য কখনও সুন্দর হরিণের রূপ ধরে, কখনও আমাদের মত জান্নাতের হুর-পরীর রূপ ধরে যারা তাদের পথ দেখাতে আসে, যারা সেই পিপাসার্ত পথিকদের পানি পান করায়, যারা জাহান্নামের এই কষ্ট থেকে তাদের উদ্ধার করে, মানুষ পরে তাদের ওপরই জুলুম শুরু করে দেয়। মানুষ পাপে এতই অভ্যস্ত যে, সুন্দর হরিণ সামনে দেখলে তারা তার ওপর তীর চালিয়ে তাকে হত্যা করে এবং তার মাংস ভক্ষণ করে। আর যখন আমাদের মত অপূর্ব সুন্দরী নারী দেখতে পায়, তখন তাকে একাকী অসহায় ভেবে আনন্দ-স্ফূর্তি ও ভোগের সামগ্রী বানাতে চেষ্টা করে। তারা এটা বোঝে না, জীবনের অন্তিম সময় এসে গেছে তাদের।

সে তখন মেয়েটাকে বলে, এসো আমার সঙ্গিনী হও, বিয়ে করে তোমাকে আমার মহলের রাণী বানাবো। বালি ও মাটির এই যে বিশ্রী স্তম্ভগুলো এসবই এই ধরনের মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য। তোমরা এদের মধ্যে গণ্য হবে না। শুয়ে পড়ো, যদি আমাদের দেখে তোমাদের মনে কোন পাপ চিন্তা এসে থাকে তবে তওবা করে ঘুমিয়ে পড়ো। নতুবা তোমাদের পরিণামও এমনিই হবে, যেমনটি দেখছো।

মানুষের এই স্বাদ ও তৃপ্তিই তার বড় দুর্বলতা। এই তৃপ্তির মোহে পড়ে মানুষ খুব কঠিন পরিণামের দিকে এগিয়ে যায়। মানুষের এই দুর্বলতা তার গৌরব ও সম্মানকে ধূলায় মিশিয়ে দেয়। জাতিগতভাবে কোন জাতি এই দুর্বলতায় জড়িয়ে পড়লে তাদের ভাগ্যেও নেমে আসে কঠিন পরিণতি।'

মেয়েটির বলার ভঙ্গিতে ছিল সম্মোহিত যাদুর প্রভাব। তা ছাড়া তারা তো ধরেই নিয়েছিল এরা এই জগতের কোন মেয়ে নয়, ফলে মেয়েটির কথা দারুণ প্রভাব ফেললো ওদের মধ্যে। তারা নিবিষ্ট মনে মেয়েটির কথা শুনে ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে গেল। ওরা একে অন্যের মুখের দিকে চাইলো এবং মেয়েটির কথা মত সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল।

পাহাড়ের কোলে ছায়াঘন সেই পরিবেশে শুয়ে পড়লো আইয়ুবীর চার পথহারা কমাণ্ডো এবং ধীরে ধীরে তারা গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলো।

চার কমাণ্ডোর সেই ঘুমন্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বড় মেয়েটির ঠোঁটে ফুটে উঠলো মুচকি হাসি। সে সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলো এবং দু'জনের ঠোঁটেই ধীরে ধীরে ফুটে উঠলো স্বস্তি ও তৃপ্তির হাসি।

০

আন নাসের যুদ্ধের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতো না। তাদের বিজয় হয়েছে এমন কোন সংবাদ তখনো পৌঁছেনি তার

কাছে। সুলতান আইয়ুবী ও তার জানবাজ বাহিনী দুশমনের সম্মিলিত বাহিনীকে পর্যদুস্ত ও বিতাড়িত করেছেন, সম্মিলিত বাহিনীর হেড অব দ্যা কমাণ্ড সাইফুদ্দিন গাজী যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেছে, সুলতান আইয়ুবী এখন সাইফুদ্দিন গাজীর আরেক সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনের প্রতি-আক্রমণের অপেক্ষা করছেন, এসব কিছুই তার জানা ছিল না।

কিন্তু সুলতান আইয়ুবী ঠিকই জানেন, মুজাফফরুদ্দিন এমন এক গাদ্দার, যে সুলতান আইয়ুবীর সমর কৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত। লোকটি একরোখা ও জেদী, কাল সাপের মত ছোবল হানার জন্য নিশ্চয়ই কোথাও ওঁৎ পেতে আছে, নইলে ময়দানে তার সাথে মোকাবেলা হতোই। মুজাফফরুদ্দিনের প্রতি-আক্রমণের আশংকায় তিনি তাই অপেক্ষা করছেন।

সুলতান আইয়ুবীর ধারণা মোটেই অমূলক বা ভুল ছিল না। মুজাফফরুদ্দিন তখন ময়দানের কাছেই এক গোপন স্থানে আত্মগোপন করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এলাকাটি ছিল জঙ্গলাকীর্ণ এক নিম্নভূমি। সেখানে সে স্ব-সৈন্যে আত্মগোপন করেছিল। সম্মিলিত বাহিনীর মাত্র এক চতুর্থাংশ সৈন্য ছিল সে বাহিনীতে। এ সৈন্য নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর সামনে টিকতে পারবে কিনা এই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছিল তাকে। তার এ দুশ্চিন্তা কিছুটা লাঘব হয়েছিল. কিছু পরাজিত সৈন্য পালিয়ে যাওয়ার সময় তার দলে যোগ দেয়ায়।

সুলতান আইয়ুবী এ বাহিনীর পরিমাণ ও উপস্থিতির কোন সঠিক খবর জানতেন না। কিন্তু বিচক্ষণ সুলতানের কাছে এটা

পরিষ্কার ছিল যে, সামনে বিপদ আছে। এ আশংকার কথা জানিয়ে তিনি তার গোয়েন্দা বাহিনীকে আশপাশে ও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রেখেছিলেন। তাদের ওপর হুকুম ছিল, 'যদি কোথাও শত্রু সেনার সন্ধান পাও, তবে সে সংবাদ দ্রুত আমার কাছে পৌঁছে দেবে।'

কিন্তু আইয়ুবী ছাড়া তার বাহিনীর অন্যান্য সদস্যের ধারণা ছিল, সাইফুদ্দিনের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে এ যুদ্ধে। এ প্রশ্ন কারো মনে উদয়ই হয়নি যে, সম্মিলিত বাহিনীর কোন দল এখনো অক্ষত আছে এবং তারা আইয়ুবীর সৈন্যদের ওপর আবার হামলা করতে পারে। বরং তাদের অটুট বিশ্বাস ছিল, দুশমন বাহিনীর এখনো যারা জীবিত আছে তাদের অধিকাংশই বন্দী। খুব সামান্য সংখ্যক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

আগেই বলা হয়েছে, মুজাফফরুদ্দিন যে অঞ্চলে অবস্থান করছিল, সেটা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও নিম্নভূমি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পানি, পানির নালা, খাল ও পানি পাওয়ার কারণে গজিয়ে উঠা গাছগাছালিতে এলাকাটি ছিল এমন জঙ্গলাকীর্ণ যে, সেখানে মানুষের যাতায়াত ও আনাগোনা ছিল না। ফলে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা সেখানে কেউ শত্রু খুঁজতে যায়নি।

মুজাফফরুদ্দিনের এ অঞ্চলটা ছিল সমরাঙ্গণ থেকে দু'আড়াই মাইল দূরে। সেখানে পাহাড় ও জঙ্গল পরিবেষ্টিত নিরাপদ স্থানে বসে সে সুলতান আইয়ুবীর ওপর আক্রমণ

চালানোর পরিকল্পনা করছিলো। সে উপলব্ধি করছিল, আর বিলম্ব করার অবকাশ নেই। অনতিবিলম্বে আক্রমণ না চালালে আইয়ুবী সুসংগঠিত হয়ে নিজের বাহিনী নিয়ে যে কোন দিকে অগ্রাভিযান চালাতে পারে।

মুজাফফরুদ্দিন যখন এসব ভাবছিল তখন তাঁবুতে প্রবেশ করলো তার এক সহ-সেনাপতি। তার সাথে আরও একজন লোক।

'কি! নতুন কোন সংবাদ আছে?' মুজাফফরুদ্দিন জিজ্ঞেস করলো।

'সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর মাঝে কোন পরিবর্তন আসেনি!' সহ-সেনাপতি বললো, 'বিস্তারিত এই লোকের কাছে শুনুন! এ লোক স্বচক্ষে দেখে এসেছে!'

'এ লোক কি আমাদের গোয়েন্দা?'

'হ্যাঁ।' সহ-সেনাপতি বললো।

'বলো, তুমি কি দেখে এসেছো?'

'সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্যবাহিনী এখনও আমাদের ফেলে আসা মালসামান ভাগ-বাটোয়ারা করেনি। তারা শুধু আহতদের উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তারা লাশগুলো দাফন করার জন্য কবর খুঁড়ছে। তাদের লাশের সঙ্গে আমাদের লাশগুলোও পৃথকভাবে দাফন করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।'

'আমাকে তাদের কথা শোনাও, যারা এখনও জীবিত আছে।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'যারা মরে গেছে, তাদের তো কবর দিতেই হবে। আমরা ময়দানে নেই, তাই আমাদের

নিহত সৈন্যদের লাশগুলো তারাই কবর দেবে, এটাই স্বাভাবিক। আমাকে বলো, সুলতান আইয়ুবী তার সেনাবাহিনীতে কোন রদবদল করেছেন কিনা? তার মূল বাহিনীর দু'পাশের বাহিনী কি আগের মতই সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, নাকি তাদের এদিক-ওদিক সরিয়েছেন আইয়ুবী?'

'সম্মানিত সেনাপতি!' গোয়েন্দা বললো, 'আমি শুধু সৈনিক নই কমাণ্ডারও। আমি যে সংবাদ দিচ্ছি তা একটু ভেবেচিন্তেই দিচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য এ নয় যে, শুধু আপনাকে খুশী করি। আমার উদ্দেশ্য ঠিক আপনারই মতই। আমিও সুলতান আইয়ুবীর বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তর করার কথাই ভাবছি।

আপনাকে বিশেষভাবে জানানো দরকার, তারা কেউ তাদের অবস্থান ত্যাগ করেনি। আমার পরামর্শ হচ্ছে, আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না।'

'পরামর্শ পরে দিও, আগে সেখানকার সৈন্যদের রিপোর্ট দাও।'

'মাননীয় সেনাপতি, দয়া করে আমাকে বাঁধা দিবেন না। আমি যা বলছি তা আমাকে বলতে দিন, দেখবেন ময়দান আপনার চোখের সামনে ভাসছে। আমি জানি, আপনার প্রথম টার্গেট সুলতান আইয়ুবীর ডাইনের বাহিনী। কারণ তারা আপনার সহজ আওতার মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমি তার সেনাবাহিনীর অন্য দিকটাও দৃষ্টির সামনে রেখে দেখেছি, আমরা যখন তার ডাইনের বাহিনীর ওপর আক্রমণ করবো,

তখন সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা অপর দিকটা কিভাবে ব্যবহার করবে।'

'তারা আমাদেরকে ঘেরাও করার চেষ্টা করবে।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'তাদের ঘেরাও কর্মসূচী শুরু হবে অনেক দূর থেকে। তারপর আস্তে আস্তে অবরোধ খাটো করে আনবে। আমি তার যুদ্ধের চাল সম্পর্কে আগাম খবর বলতে পারি।'

সুলতান আইয়ুবী তার রিজার্ভ বাহিনী, যে বাহিনী দিয়ে আমাদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছেন, সে বাহিনীকে এক ক্রোশ পিছনে সরিয়ে নিয়ে আবার প্রস্তুত করে রেখেছেন। আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, সুলতান আইয়ুবী আমাদের বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলতে চেষ্টা করবেন।

আরও খবর আছে। সুলতান আইয়ুবীর ডাইনের বাহিনী থেকে দেড় ক্রোশ পিছনে আমাদের ও সুলতান আইয়ুবীর মৃত সৈন্যদের লাশের জন্য কবর খোদাই করা হয়েছে। কবরের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। কবরগুলো তারা করেছে পাশাপাশি এবং বিশেষ পদ্ধতিতে। দেড় হাজার কবর মানে দেড় হাজার গর্ত। আমি কবরের চওড়া দিকটা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছি। আপনি যখন ডান দিক থেকে আক্রমণ চালাবেন, আইয়ুবীর সৈন্যরা পিছনে সরতে থাকবে। আপনি ধাওয়া করে তাদেরকে কবরের কাছে নিয়ে যাবেন। সামনা-সামনি আঘাত না করে আপনি এলোপাথাড়ী তীর বর্ষণ করবেন। তাদেরকে বাধ্য করবেন কবরের দিকে চলে যেতে। তারপর আপনি যখন

তাদের অশ্বারোহী সৈন্যদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালাবেন, অশ্বসহ তারা তখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে সেই কবরে। এ ছাড়া সেখানে অসংখ্য লাশ গাদা করে রাখা হয়েছে, তারা লাশের সঙ্গেও বাঁধা পাবে, ফলে যুদ্ধের গতি সহজেই চলে আসবে আমাদের অনুকূলে।'

'সুলতান আইয়ুবীর ডান দিকের ব্যাটেলিয়ানকে কতটা শক্তিশালী মনে করো তুমি?' মুজাফফরুদ্দিন জিজ্ঞেস করলো।

'কমের পক্ষে এক হাজার অশ্বারোহী ও দেড় হাজার পদাতিক রয়েছে এ বাহিনীতে।' গোয়েন্দা কমাণ্ডার উত্তরে বললো, 'এই বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় আছে। আপনি তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করতে পারবেন না।'

মুজাফফরুদ্দিনের সামনে ময়দানের একটি নকশা পড়েছিল। সে সেই নকশার উপরে হাত রেখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, 'এই হলো আইয়ুবীর ডাইনের বাহিনী। তাদের সামনের ময়দান কিছুটা অসমান। ছোট বড় নানা রকম গর্ত এবং উঁচু ঢিবিও আছে সেখানে। তার দক্ষিণ দিকটা পরিষ্কার। আক্রমণের জন্য এ রাস্তা অধিক উপযুক্ত মনে হয়। এ পথে সরাসরি প্রচণ্ড হামলা চালাতে পারলে তারা পিছু হটতে বাধ্য হবে এবং কবরে গিয়ে পড়বে।'

'হ্যাঁ, সেই কবরেই আমি ওদের দাফনের ব্যবস্থা করবো। আমার আক্রমণ সামনে থেকেও হবে এবং ডাইনের পরিষ্কার জায়গা দিয়েও হবে।'

মুজাফফরুদ্দিন তার সহ-সেনাপতিকে বললো, 'এখান

থেকে ময়দান পর্যন্ত এর মাঝখানে এখন থেকে কোন লোক দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে এনে বন্দী করবে এ আস্তানায়। এ অঞ্চল পুরোটাই এখন যুদ্ধের আওতার মধ্যে এসে গেছে। এদিক দিয়ে কোন যাত্রী আর চলাচল করতে পারবে না। এদিকের সারা পথে এখন থেকে থাকবে শুধু আমার গোয়েন্দা।

০

হতভাগা দুই মুসাফিরের জানা ছিল না, এ অঞ্চল এখন যুদ্ধের আওতার মধ্যে পড়ে আছে। তাদের একজন এক উটের ওপর সওয়ার ছিল। লোকটা খুব বৃদ্ধ। তার সমস্ত দাড়িই ধবধবে সাদা। উটের ওপর কিছু মালপত্রও আছে। অপর ব্যক্তি উটের লাগাম ধরে টানছিল।

তারা দু'জনই গ্রাম্য বেদুইনদের পোষাক পরিহিত। তারা এমন জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল, যেখান থেকে মুজাফফরুদ্দিনের লুকানো সৈন্য বাহিনী দেখা যাচ্ছিল।

এক সৈনিক তাদের ডাকলো। কিন্তু তারা দাঁড়ালো না, বরং যাত্রার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। তারা না থামায় এবার এগিয়ে গেল এক অশ্বারোহী। দ্রুত তাদের সামনে গিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। বাধ্য হলো তারা থেমে যেতে।

অশ্বারোহী মুসাফিরদেরকে বললো, 'ক্যাম্পে চলো। তোমাদের তল্লাশী নেয়া হবে।'

'আমরা মুসাফির!' উটের লাগামওয়ালা বললো, 'আপনাদের কি ক্ষতি করেছি যে, আমাদের পথ চলতে দিচ্ছেন না?'

'আমাদের ওপর আদেশ আছে, এদিক দিয়ে যে যাবে তাকেই ধরে নিয়ে যেতে হবে ক্যাম্পে। ব্যস, আর কোন কথা নয়, চলো।' অশ্বারোহী ধমকে উঠলো।

ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বারোহী ক্যাম্পে ফিরলো। এক তাঁবুর সামনে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে তাঁবুর মধ্যে সংবাদ দেয়া হলো। কমাণ্ডার বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। সে মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কোত্থেকে আসছো এবং কোথায় যাবে?'

তারা যে উত্তর দিল তাতে কমাণ্ডার নিশ্চিত হলো, এরা কোন গোয়েন্দা নয়। কিন্তু তবু তাদের বলা হলো, 'তোমাদেরকে এখন আর সামনে যেতে দেয়া যাবে না। কয়েদী করে নয় সসম্মানে রাখা হবে তোমাদের।'

'এভাবে আমাদের কতদিন মেহমান রাখবেন?' জানতে চাইলো বৃদ্ধ।

কিন্তু এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে সেন্ট্রির দিকে তাকিয়ে কমাণ্ডার বললো, 'এদের থাকার তাঁবু দেখিয়ে দাও।'

এ হুকুম জারি করে কমাণ্ডার আবার তার তাঁবুতে ঢুকে পড়লো। মুজাফফরুদ্দিনের আদেশে আটকাপড়া মুসাফির এই প্রথম।

মুসাফিররা সেন্ট্রিকে অনুরোধ করলো তাদের ছেড়ে

দিতে। অনেক কাকুতি মিনতি করলো, কিন্তু তাদের অনুরোধ কেউ শুনলো না।

তাদের যে তাঁবুতে রাখা হলো, সেখানে পালাক্রমে দুই সিপাহী ডিউটি দিচ্ছিল।

রাত। ডিউটিরত দুই সিপাহী বসেছিল তাঁবুর সামনে। রাত ক্রমে গভীর হতে লাগলো। দুই সেন্ট্রি তাঁবুর সামনে বসে নিশ্চিন্ত মনে গল্প করছে। তাদের ধারনা, নিরীহ দুই বন্দী ঘুমিয়ে আছে তাঁবুর ভেতর। তাদের দিক থেকে কোন রকম বিপদ আসতে পারে, এমন কথা সেন্ট্রিদের কল্পনারও অতীত।

এক পাহারাদার তার সঙ্গীকে বললো, 'দোস্ত, কি কপাল দেখ, বন্দী হয়েও বুড়ো আর তার খাদেম নিশ্চিন্তে তাঁবুর ভেতর আরামে ঘুমাচ্ছে, আমরা শত্রু নেই, যুদ্ধ নেই, তবু ঘুম হারাম করে পাহারা দিচ্ছি এক আজনবী বৃদ্ধকে।'

সাদা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ তখনও জেগেই ছিল। সে তাঁবুর মধ্যে শুয়ে শুয়ে শুনছিল সেন্ট্রিদের আক্ষেপ ভরা কণ্ঠ। তাঁবুর ভেতর ঘন অন্ধকার।

একটু পর বৃদ্ধ তাঁবুর বাইরে নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলো। বুঝলো, সিপাহী দুইজন জেগে থাকা নিরর্থক ভেবে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে তার খাদেমকে আস্তে করে টোকা দিল। হাতে মৃদু চাপ দিয়ে সাড়া দিল খাদেম। দু'জন নিঃশব্দে উঠে বসলো বিছানায়। বেড়ালের মত সন্তর্পনে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

দরজার কাছে পৌছে পর্দা ইষৎ ফাঁক করে বাইরে মুখ

বাড়ালো বৃদ্ধ, দেখলো কাছেই পাশাপাশি দুই সেন্ট্রি হাঁটুতে মাথাগুঁজে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

দ্রুত তাঁবুর বাইরে চলে এলো ওরা। বাইরে নীরবতা বিরাজ করছিল। তাঁবু থেকে কিছু দূরে গিয়ে বৃদ্ধ তার সাথীকে বললো, 'তুমি পৃথক হয়ে যাও। দু'জন আলাদা থাকলে একজন ধরা পড়লেও আরেকজনের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকবে।'

দু'জন দু'দিকে পৃথক হয়ে গেল। আলাদা হয়েই বুড়োর সঙ্গী তাঁবুর উল্টো দিক দিয়ে দ্রুত পা চালালো ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য।

তাদের ধারণা সঠিক ছিল না, পুরো ক্যাম্প ঘুমিয়ে থাকলেও ক্যাম্পের পাহারাদাররা ছিল সজাগ ও সতর্ক। তেমনি এক ক্যাম্প প্রহরীর চোখে অন্ধকারে কারো ছায়া নড়ার দৃশ্য ধরা পড়লো। সেও বসেছিল অন্ধকারেই, ফলে চলমান ছায়াটি তাকে দেখতে পেলো না।

প্রহরী কোন রকম সাড়া শব্দ না করে ছায়াটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলো। কিছুদূর যাওয়ার পর কিছুতে হোঁচট খেল প্রহরী, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ তাকালো পিছন দিকে। তাকিয়েই দেখতে পেল এক প্রহরী তাকে অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলো কাছেই কিছু আসবাবপত্র পড়ে আছে। সে কালবিলম্ব না করে তার আড়ালে গিয়ে লুকালো।

এরপর শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। প্রহরী তাকে খুঁজতে লাগলো আর বৃদ্ধ এখানে ওখানে পালাতে লাগলো। ঠিক

একইভাবে তার সাথীকেও দেখে ফেললো অন্য এক প্রহরী। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের সাথীও লুকিয়ে পড়লো।

মুজাফফরুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় ছিল। কারণ সে জানতো আইয়ুবীর গোয়েন্দারা কেমন তৎপর ও চৌকস। তাই দুশমনের গোয়েন্দাদের ওপর কড়া দৃষ্টি রাখার হুকুম ছিল তার। তার আরও নির্দেশ ছিল, 'গোয়েন্দাদের দেখা পেলে তাদের হত্যা না করে ধরতে চেষ্টা করবে।'

সুতরাং মুজাফফরুদ্দিনের প্রহরীরা গোয়েন্দাদের ধরার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হলো। এ কারণেই বৃদ্ধ ও তার সাথীকে দেখার পরও তাদেরকে ডাকেনি ওরা, অনুসরণ করে তাদের ধরার চেষ্টা করছিল।

বৃদ্ধ ও প্রহরীর লুকোচুরি খেলা তখনো চলছে। বৃদ্ধ এখান থেকে ওখানে ছুটছে লুকাতে, আর তাকে তালাশ করতে তার পিছু পিছু ছুটছে প্রহরী। এবার বৃদ্ধ লুকালো জড়ো করে রাখা কিছু কাঠের আড়ালে, ঘন অন্ধকারের মধ্যে। কাঠগুলো যেভাবে রাখা, তাতে তার এক হাত দূর দিয়ে গেলেও প্রহরী তাকে দেখতে পাবে না।

প্রায় কাছাকাছি চলে এলো প্রহরী। বৃদ্ধ দম বন্ধ করে পড়ে রইলো সেই স্তুপীকৃত কাঠের আড়ালে। সাবধানে এক পা, এক পা করে এগুতে লাগলো প্রহরী। খানিক থমকে দাঁড়ায়, খানিক এগোয়, এভাবে এগুতে এগুতে একেবারে তার পাশ কেটে সামনে এগিয়ে গেল প্রহরী। এমনি একটি

সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল বৃদ্ধ। প্রহরী তার হাত দুয়েক দূরে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো। বৃদ্ধ খঞ্জর বের করে তৈরী হলো। তারপর আলগোছে পা তুললো কাঠের আড়াল থেকে।

সে জানে, প্রহরীর হাত থেকে মুক্তির এখন একটি পথই খোলা আছে, আর তা হচ্ছে তাকে হত্যা করা। বৃদ্ধ পা উঠালো, খঞ্জর তাক করা হাতটি নিয়ে এলো বুক বরাবর, তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

প্রহরী হয়তো শেষ মুহূর্তে কিছু আঁচ করতে পেরেছিল, পই করে ঘুরে দাঁড়ালো সে, আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের খঞ্জর আমূল ঢুকে গেল লোকটির বুকে। চিৎকার করারও সময় পেলো না প্রহরী, বাম হাত দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তাল সামলাতে না পেরে তাকে নিয়েই পড়ে গেল বৃদ্ধ। সে অবস্থায় থেকেই বৃদ্ধ দ্রুত খঞ্জর টেনে বের করলো এবং পরপর আরও কয়েকটি আঘাত করলো।

লোকটি মারা গেল। নিস্তেজ হয়ে গেল তার দেহ। বৃদ্ধ তাকে রেখে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো এবং সেখান থেকে পালানোর চিন্তা করলো।

ধ্বস্তাধ্বস্তি সামান্য হলেও নির্জন রাত বলে তার আওয়াজ স্পষ্টই শুনতে পেলো অন্য প্রহরী। আওয়াজের উৎস লক্ষ্য করে সে যখন তাদের কাছাকাছি এসেছে ততক্ষণে একজন বিদায় নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে পরপারে।

প্রহরীরা ঘটনাস্থলে এসে যখন কি ঘটছে বুঝতে পারলো. তখন দেরী না করে পিছন থেকে জোরে চেপে ধরলো বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ এ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সজাগ হয়ে উঠলো তার পঞ্চেন্দ্রিয়। শরীরের সর্বশক্তি দিয়ে বৃদ্ধ ধাক্কা দিল প্রহরীকে। প্রহরী ছিটকে গিয়ে পড়লো পেরেকআঁটা কাঠের এক তক্তার ওপর। প্রহরীর গলা চিরে বেরিয়ে এলো মরণ চিৎকার।

বৃদ্ধ ছুটলো দ্রুত, কিন্তু কিছুর মধ্যে পা আটকে পড়ে গেল। হাঁচড়ে পাঁচড়ে বৃদ্ধ আবার উঠে দাঁড়ালো এবং দৌড় দিল।

ততক্ষণে চারদিকে মশাল জ্বলে উঠেছে। তিন চারজন প্রহরী এক সঙ্গে ছুটলো বৃদ্ধকে ধরার জন্য। মশালের আলোয় তারা দেখলো, সাদা দাড়িওয়ালা যে বৃদ্ধকে তারা মনে করেছিল জয়ীফ ও দুর্বল, সে ততটা দুর্বল নয়। নিজেকে মুক্ত করার জন্য বৃদ্ধ এমন তেজের সাথে লড়ছিল, যে শক্তির প্রদর্শনী কেবল কোন প্রশিক্ষিত যুবকের পক্ষেই সম্ভব।

সে ছিল একা আর তাকে ঘেরাও করে ধরেছিল ছয়-সাতজন প্রহরী। ফলে সে চেষ্টা করেও তাদের থেকে মুক্ত হতে পারলো না। কিন্তু এই চেষ্টা করতে গিয়ে তার আসল পরিচয় ফাঁস করে দিল দুশমনের সামনে। কারণ ততক্ষণে তার সাদা দাড়ি খসে পড়েছে। সেখানে এখন শোভা পাচ্ছে সুন্দরভাবে ছাটা ছোট ছোট কালো দাড়ি। সকলেই দেখলো, এ কোন বৃদ্ধ নয়, বরং এক যুবক সৈনিক। সম্ভবত আইয়ুবীর এক জানবাজ কমাণ্ডো।

তাকে কাবু করার পর যেখানে একটু আগে সে এক

প্রহরীকে খঞ্জর মেরে হত্যা করেছে মশাল নিয়ে সেখানে গেল প্রহরীরা। মশালের আলোয় তারা দেখতে পেলো, এ লোক তাদের কোন প্রহরী নয়, বরং সে তারই সঙ্গী ছিল। এ মৃত যুবক ছিল সাদা দাড়িবেশী বৃদ্ধের খাদেম। অন্ধকারে ওরা পরস্পরকে চিনতে পারেনি, এখানকার প্রহরী মনে করে অন্ধকারে নিজের একমাত্র সাথীকেই হত্যা করেছে এ যুবক।

লাশের ময়না তদন্ত নেয়া হলো। তার কাপড়ের মধ্যেও পাওয়া গেল খঞ্জর। তাদের উটের ওপর যেসব মালামাল ছিল, এবার তা খুলে দেখলো প্রহরীরা। কিন্তু তাতে তেমন কিছু ছিল না, শুধু বস্তাতে কিছু ঘাস ও খড় বোঝাই করা ছিল।

গোয়েন্দা যুবককে এক সহ-সেনাপতির তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। সহ-সেনাপতি তার কাছে অনেক কিছু জানতে চাইলো। কিন্তু সে কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। সে এমন নীরবতা পালন করলো, যা সহ্য করা সত্যি কঠিন। কিন্তু সহ-সেনাপতিকে তাতেও বিরক্ত মনে হলো না।

প্রহরীরা সেনাপতির কাছে তার মুখের নকল সাদা দাড়ি হাজির করলো। সহ-সেনাপতি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেও কোন জবাব পেলো না তার কাছ থেকে। কিন্তু এটা এমন এক প্রমাণ, যার সত্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তাকে বলা হলো, 'তাহলে তুমি স্বীকার করছো, তুমি এবং তোমার সাথী সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা!'

এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিল না ধৃত যুবক।

সহ-সেনাপতি বললো, 'ঠিক আছে, ওকে শাস্তি সেলে

নিয়ে যাও। সে তার পরিচয় না দিলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার পরিচয় দেবে।'

তাকে শাস্তি সেলে ঢুকানো হলো। নানা রকম শাস্তি দেয়া হলো, অসহ্য মারপিট করা হলো, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করলো না, সে আইয়ুবীর গোয়েন্দা।

রাত কেটে গেল। সকাল বেলা তাকে উপস্থিত করা হলো মুজাফফরুদ্দিনের সামনে। রাতে যা ঘটেছে সে সম্পর্কে অবহিত করা হলো তাকে। তার নকল দাড়ি ও উটের বোঝা সেনাপতি মুজাফফরুদ্দিনের সামনে হাজির করা হলো।

'তুমি আলী বিন সুফিয়ানের শাগরেদ নাকি হাসান বিন আব্দুল্লাহর?' মুজাফফরুদ্দিন তাকে জিজ্ঞেস করলো।

'আমি এ দু'জনের কাউকে চিনি না।' উত্তর দিল যুবক।

'আমি এ দু'জনকেই ভাল মত চিনি।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'আমি নিজেও সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর শাগরেদ ছিলাম। ওস্তাদ তার শাগরেদকে কখনও ধোঁকা দিতে পারে না।'

'আপনার সাথে যেমন আমার কোন সম্পর্ক নেই তেমনি সুলতান আইয়ুবীর সাথেও আমার কোন সম্পর্ক নেই।' বললো বন্দী।

'শোনো, হে হতভাগা বন্ধু!' মুজাফফরুদ্দিন তার কাঁধে হাত রেখে বললো, 'আমি তোমার সাথে কোন ঝগড়া করবো না। আমি তোমাকে অযোগ্য এবং অকম্মাও বলবো না। তুমি তোমার দায়িত্ব সুন্দরভাবেই পালন করেছো। ধরা পড়া কোন

দোষের ব্যাপার নয়, সেটা দুর্ভাগ্য। তোমার দুর্ভাগ্যের পরিমাণটা একটু বেশী, নইলে তোমার সাথী তোমারই হাতে খুন হতো না। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করে বলে দাও, তোমার কোন সঙ্গী এখান থেকে সংবাদ নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছেছে কিনা, আমরা যে এখানে আছি এবং কতজন আছি সে খবর সুলতান জানেন কিনা? আর এ কথাও বলো, তোমাদের সৈন্যরা যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এখানে বসে আছে কেন? সেখানে কি তৎপরতা ও প্রস্তুতি চলছে? মাত্র এই প্রশ্ন কয়টির উত্তর দাও, আমি তোমার সাথে কোরআন ছুঁয়ে শপথ করছি, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তোমাকে মুক্ত করে দেয়া হবে। এখন তোমাকে এখানে সসম্মানে রাখা হবে।'

'আপনার অঙ্গীকার ও কসমের ওপর আমার কোন বিশ্বাস নেই।' সে বললো, 'কারণ আপনি কোরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

মুজাফফরুদ্দিন ধৈর্য ধারণ করে বললো, 'তুমি বলতে চাচ্ছো, আমি মুসলমান নই?'

'হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই মুসলমান!' বন্দী কমাণ্ডো বললো, 'কিন্তু আপনি কোরআনের অনুগত নন, ক্রুশের অনুগত!'

'আমি তোমার অভিযোগ এই শর্তে মেনে নিতে পারি যে, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে।' মুজাফফরুদ্দিন বললো, 'তোমার জীবন মৃত্যু এখন আমার হাতে।'

'না, জীবন মৃত্যুর মালিক আপনি নন, আল্লাহর ইচ্ছে না থাকলে আপনি আমার জীবন কেড়ে নিতে পারবেন না।'

কমাণ্ডো এবার মুজাফফরুদ্দিনের অভিযোগ মেনে নিয়ে বললো, 'আপনি আমাদের সেনাবাহিনীতে ছিলেন, আপনার ভাল মতই জানা আছে, আমাদের সব সৈনিক তার জীবন আল্লাহর হাতে সঁপে দেয়। আমি আপনাকে বলে দিতে চাই, আমি যেমন আইয়ুবীর বাহিনীর এক সামান্য গোয়েন্দা, আমার সঙ্গীও তাই। আমি আর আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দেবো না। আমি এখনো বেঁচে আছি, অতএব তোমরা ইচ্ছা করলে এখন আমার গায়ের চামড়া খুলে নিতে পারো, কিন্তু আমার মুখ থেকে তোমাদের কোন প্রশ্নের উত্তর কখনও শুনতে পারবে না। আমি তোমাকে এ কথাও বলে দিতে চাই, পরাজয় আল্লাহ তোমার ভাগ্যেই লিখে রেখেছেন, আমাদের নয়।'

'এর পায়ের গিরাতে শক্ত করে রশি বাঁধো, আর উল্টো করে গাছের ডালে লটকিয়ে দাও।' মুজাফফরুদ্দিন একটি গাছ দেখিয়ে এ হুকুমনামা জারী করে দ্রুত তার তাঁবুতে চলে গেলো।

o

'ওদের দু'জনের একজনও এখন পর্যন্ত ফিরলো না!' হাসান বিন আব্দুল্লাহ সুলতান আইয়ুবীকে বললো, 'তাদের ধরা পড়ার তো কোন ভয় ছিল না। আমাদের গোয়েন্দাদের ধরার মত লোক এখানে আর কে আছে? তাছাড়া তাদের তো বেশী দূরে যাওয়ারও কথা নয়, তবে দেরী হচ্ছে কেন?'

'তারা গ্রেফতারওতো হয়ে যেতে পারে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তারা সেই সকালে গিয়েছে, এখন সন্ধ্যা।

কিন্তু এখনও তাদের ফেরার নাম নেই, মনে হয় তারা ধরাই পড়েছে। তাদের এখন পর্যন্ত না আসাই প্রমাণ করে, আশেপাশে শত্রু আছে। আজ রাতে আরও কয়েকজনকে পাঠিয়ে দাও। তারা আরো কয়েক মাইল পর্যন্ত দেখে আসুক।'

সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দাদের নিয়ে কথা বলছিলেন হাসান বিন আব্দুল্লাহর সাথে। যে দুই গোয়েন্দাকে সকালে পাঠিয়েছিলেন আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করতে, তাদের না ফিরার কারণে পেরেশান ছিলেন দু'জনই। নিজের গোয়েন্দা সংস্থার ওপর সব সময় ভরসা ছিল সুলতান আইয়ুবীর। এই গোয়েন্দাদের দিয়েই তিনি শত্রুদের নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছেন। কিন্তু আজ দুই গোয়েন্দার ফিরে না আসার একটিই কারণ হতে পারে, তারা ধরা পড়েছে। কিন্তু আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের ধরে এমন সাধ্য কার? সুলতান ভেবে দেখলেন, একমাত্র মুজাফফরুদ্দিনই তা পারে। কারণ মুজাফফরুদ্দিন তাঁরই শাগরেদ, তার সমর কৌশল সম্পর্কেও মুজাফফরুদ্দিন জ্ঞাত।

গত রাতে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দার লাশ তুর্কমানের কিছু দূরে এক নির্জন প্রান্তরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তার বুকে বিদ্ধ ছিল বিষাক্ত তীর।

মুজাফফরুদ্দিন তার সহ-সেনাপতিদের বলেছিলো, 'যদি তোমরা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দাদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারো, তবে তিনি অন্ধ ও বোবা হয়ে যাবেন। কেবল তখনই তোমরা তাকে পরাজিত করার চিন্তা করতে পারো।'

সুলতান আইয়ুবী এই দু'টি ঘটনাকে তুচ্ছ মনে করলেন না। তার আদেশে হাসান বিন আব্দুল্লাহর ছয়জন কমাণ্ডো সেনা রাতের আঁধারেই নিখোঁজ গোয়েন্দাদের সন্ধানে যাত্রা করলো।

সুবহে সাদেকের পর মসজিদে ফজরের আজান ধ্বনিত হলো। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে ঘুম ভাঙ্গলো সুলতান আইয়ুবীর। তিনি তাঁবুর বাইরে গেলেন। খাদেম মশাল জ্বালিয়ে তার তাঁবুর সামনে রেখে দিল।

এ সময় একদিক থেকে ছুটে এলো এক অশ্বারোহী। থামলো এসে সুলতান আইয়ুবীর সামনে। দ্রুত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে সালাম দিল সুলতানকে। তারপর সময় ক্ষেপন না করে বলতে লাগলো, 'সুলতান, আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হোক! মনে হয় আপনার ডান বাহিনীর অদূরে দুশমন সৈন্য সমাবেশ করছে। অন্ধকারে ওদের দেখা না গেলেও তাদের আনাগোনার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য দু'জনকে পাঠিয়েছি, তারা সঠিক খবর নিয়ে এখুনি আপনার সামনে হাজির হবে।'

অশ্বারোহীর কথা শেষ হলো না, দূর থেকে শোনা গেল অশ্বখুরধ্বনি। সুলতান এবং অশ্বারোহী উভয়েই কথা বন্ধ করে সেদিকে তাকালো। নতুন এক অশ্বারোহী ছুটে এসে ঘোড়া থামালো সুলতানের সামনে। সে ঘোড়া থেকে নামার আগেই সুলতান প্রশ্ন করলেন, 'কি খবর নিয়ে এসেছো?'

'খবর সঠিক, দুশমন সৈন্য এগিয়ে আসছে আপনার ডান পাশের বাহিনীর দিকে।'

সুলতান আইয়ুবী কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিলের সেনাপতিদের নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এদেরকে জলদি খবর দাও।'

সুলতান তাদেরকে খবরের জন্য পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে বসে পড়লেন এবং তায়াম্মুম করে নিলেন। কারণ তার কাছে ওজু করার মত সময় ছিল না। তায়াম্মুম শেষে সেখানেই তিনি কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ে নিলেন। নামাজ শেষে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে তিনি তার ঘোড়া আনতে বললেন।

'এ মুজাফফরুদ্দিন ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।' সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের বললেন, 'এ সৈন্য দল খৃস্টানদের নয়। তাদের আক্রমণের সময় এখন নয়। যদি এ সংবাদ সত্যি হয় যে, শত্রু সৈন্য আমাদের ডান দিক থেকে আসছে এবং আমাদের ডান বাহিনীকেই ওরা প্রথম টার্গেট বানাতে চায়, তবে মনে রেখো, ওরা দুই তরফা আক্রমণ চালাবে। তোমরা কোন দলকেই পিছনে হটতে দিবে না। তোমাদের পিছনে দেড় হাজার কবরের গর্ত রয়েছে। সব লাশ এখনও দাফন করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ শুরু হলে তোমরা আস্তে আস্তে পিছু হটবে। পিছনের সৈন্যদের সুযোগ দেবে কবর পেরিয়ে ওপাশে চলে যাওয়ার। এরপর তাদের সহায়তায় তোমরাও পার হয়ে আসবে কবরের সীমানা। পুরনো সৈন্য নয়, এই গর্তগুলো আমি ভরে তুলতে চাই এই নবাগত সৈন্যদের লাশ দিয়ে। সেই লাশ আমি কষ্ট করে কবরে নামাতে চাই না, আমি চাই ওরা পায়ে হেঁটে সেই কবরে নেমে যাক।'

সুলতান আইয়ুবী ঘোড়ায় আরোহণ করলেন, তার রক্ষীবাহিনীর বারো জন রক্ষী চললো তার পিছনে। তারাও অশ্বারোহী। রক্ষী ছাড়া তিনি ছয়জন কাসেদও সঙ্গে নিলেন সংবাদ সরবাহের জন্য। আর নিলেন দু'জন সেনাপতি।

তিনি দ্রুত ঘোড়া ছুটালেন এবং পাহাড়ের এমন এক উঁচু স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন, যেখান থেকে তার ডানের বাহিনীর এলাকা ও সৈন্যদের দেখা যায়।

রাতের আঁধার কেটে ভোরের আলো ফুটছিল একটু একটু করে। তিনি উপত্যকা থেকে নিচে নামলেন এবং ডান পাশের সৈন্যদের কমাণ্ডারকে ডেকে বললেন, 'অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘোড়ায় আরোহণ করতে বলো। পদাতিক বাহিনীকে বলো অতিসত্ত্বর সামনের ময়দানে পজিশন নিতে আর তীরন্দাজ বাহিনীকে পরিখা, নিম্নভূমি ও উপরের নিরাপদ স্থানে তীর-ধনুক নিয়ে অবস্থান নিতে বলো। সবাইকে বলো, তারা যেন তাড়াতাড়ি যুদ্ধের পজিশন নিয়ে বসে থাকে।'

কমাণ্ডাররা নিজ নিজ সৈন্যদের পজিশনে বসিয়ে দিল।

সুলতান বললেন, 'এখন থেকে ডান পাশের বাহিনীকে আমি নিজে উপস্থিত থেকে কমাণ্ড করবো।' তিনি সেই বাহিনীর সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাসেদ পাশে রাখো, তাদের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে আমার সাথে যোগাযোগ ঠিক রাখবে এবং প্রতিটি নির্দেশ বিচক্ষণতা ও দ্রুততার সাথে পালন করবে।'

সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর গতি এমনিতেই ছিল দ্রুত ও

বেগবান, আইয়ুবীর এ নির্দেশ পাওয়ার পর তাদের গতি যেন বিজলীর মত দ্রুতগতি হয়ে উঠলো। সুলতানের যে কোন নির্দেশ পালনের জন্য সৈন্যরা অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। সুলতানের প্রতিটি চাল বা কৌশল মুহূর্তে সারা ময়দানে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সীনা টান করে অপেক্ষা করতে লাগলো কাসেদ বাহিনী। বিজলীর মতই দ্রুত গতিতে সুলতানের আদেশ তারা পৌঁছে দিতে লাগলো সৈনিকদের কানে কানে।

মুজাফফরুদ্দিনের সৈন্যবাহিনী তখনও নিকটবর্তী হয়নি, সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনীকে তৎপর করে তোললেন।

ময়দানে নেমে এলো মুজাফফরুদ্দিনের সেনাবাহিনী। প্রথমে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিলো মুজাফফরুদ্দিন। যেইমাত্র তার প্রথম অশ্বারোহী দল সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদলের সামনে এলো, অমনি শুরু হলো তীর বৃষ্টি। মুহূর্তে তার সব প্ল্যান প্রোগ্রাম যেন উলট-পালট হয়ে গেল। কারণ এখানে অসংখ্য মাটির ঢিবি ও গর্ত ছিল। সেই সব গর্ত থেকে সুলতান আইয়ুবীর তীরন্দাজেরা অবিরাম তীর বর্ষণ করে চললো। তারা দ্রুতগামী ঘোড়া এবং তার আরোহী উভয়কেই তীর মেরে ঘায়েল করতে লাগলো। ধরাশায়ী হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো মুজাফফরুদ্দিনের অশ্বারোহী সৈন্যরা।

যে সব ঘোড়া তীরের আঘাতে আহত হলো, সে সব ঘোড়া পাগলের মত এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। এমন ঘটনা তো প্রত্যেক যুদ্ধ ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, মুজাফফরুদ্দিনের জন্য এই অবস্থা বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু তার অশান্তির কারণ হলো, তার আশার বিপরীত সুলতান আইয়ুবীর ডানের সেনাদল সজাগ ছিল ও মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল।

এই প্রচণ্ড আক্রমণে সুলতান আইয়ুবীর অসংখ্য তীরন্দাজও হতাহত হয়। এই কোরবানী বিফলে যায়নি, মুজাফফরুদ্দিনের আক্রমণের প্রচণ্ডতা তীরন্দাজদের এই তীর খেয়েই শেষ হয়ে যায়। এরপর আসে সুলতান আইয়ুবীর সেই বিশেষ আক্রমণের পালা, যার কথা মনে হলেই দুশমন সৈন্যদের পানির পিপাসা পেয়ে যায়।

মুজাফফরুদ্দিন এই আশা নিয়ে যুদ্ধে এসেছিলো যে, সে সুলতানের বাহিনীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর, যেমনটি তার ওস্তাদ সুলতান আইয়ুবী করে থাকেন। তার সে আশা-ভরসা তীরন্দাজদের আঘাতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এখন সুলতান আইয়ুবী তার আপন চাল অনুযায়ী যুদ্ধ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তার যেসব তীরন্দাজ সৈন্য মুজাফফরুদ্দিনের অশ্বারোহী বাহিনীর পদতলে জীবন উৎসর্গ করেছিল, তার সুফল এখন সুলতান আইয়ুবীর হাতে।

মুজাফফরুদ্দিনের অশ্বারোহী বাহিনীর কিছু সৈন্য

তীরন্দাজদের আঘাত থেকে বেঁচে সামনে চলে এসেছিল। সুলতান আইয়ুবী আক্রমণকারীদের প্রচণ্ড আক্রমণ দেখলেন এবং এই অশ্বারোহীদের মোকাবেলা করার জন্য নিজের অশ্বারোহী দলকে নির্দেশ দিলেন।

সুলতান আইয়ুবী এবার বামের অশ্বারোহী দলের দিকে ঘোড়ার মুখ ঘুরালেন এবং তীরবেগে ঘোড়া ছুটলেন তাদের দিকে। সাথে সাথে ডানের বাহিনী তীর বেগে সরে দাঁড়ালো ময়দান থেকে। আক্রমণকারী শত্রুদের সামনে থেকে মুহূর্তে সব বাঁধা অপসারিত হয়ে গেল।

শত্রু সেনারা যখন ময়দান ছেড়ে দেয়ার কথা ভাবছিল, সে সময় ময়দান এমন উন্মুক্ত দেখে আবার দুঃসাহসী হয়ে উঠলো এবং আগ-পিছ না ভেবে মুজাফফরুদ্দিনের অবশিষ্ট সৈন্য সামনে এগিয়ে এলো। সুলতান আইয়ুবী এটাই চাচ্ছিলেন, তিনি ডান ও বামের সৈন্য বাহিনীর মাঝখানের ফাঁক দূর করে তাদের একত্রিত করে দিলেন। এই দুই বাহিনী একত্রিত হয়ে তাদেরকে তিন পাশ থেকে ঘিরে ধরলো।

মুজাফফরুদ্দিনের বাহিনী সামনে এগিয়ে গেল। তাদের পেছনে আইয়ুবীর ডান-বামের বাহিনী একত্রিত হয়ে ক্রমশ তাদের ঘেরাও সংকুচিত করে আনছিল। মুজাফফরুদ্দিনের তিন দিক ঘিরেছিল এই বাহিনী. সামনে আইয়ুবীর মূল ফৌজ।

আইয়ুবীর সম্মুখ বাহিনীর দিকে ছুটছিল মুজাফফরের বাহিনী. এ সময় তিন দিকের ঘেরাও সংকুচিত করে তাদের ওপর আঘাত হানলো আইয়ুবীর ঘেরাওকারী বাহিনী।

তিন দিকের আক্রমণে শত্রু সেনারা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলো। তাদের ওপর আইয়ুবীর পার্শ্ব সেনাদের বর্শার একটি আঘাতও ব্যর্থ হলো না।

আক্রমণকারী সৈন্যের নজর ছিল সামনের দিকে। সেদিকেই তারা ছুটে চলছিল তীব্র গতিতে, দু'পাশে নজর দেয়ার মত কোন সুযোগ ছিল না তাদের। কিন্তু এ আক্রমণ তাদের হতভম্ব করে দিল। তারা দেখলো, সম্মুখ বাহিনীর একটি পাশ এখনো ফাঁকা, চারদিক থেকে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আগেই এ ফাঁক গলে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই তাদের। সেই ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার জন্য মুজাফফরুদ্দিনের বাহিনী এবার ছুটলো সেদিকে। কিন্তু সে ফাঁকেই যে পড়ে আছে দেড় হাজার কবর, জানা ছিল না তাদের।

প্রচণ্ড বেগে ছুটছিল মুজাফফরুদ্দিনের অশ্বারোহী বাহিনী। মুহূর্তে গিয়ে পড়লো সেই কবরের সামনে। মুখ হা-করা দেড় হাজার কবর দেখে থমকে দাঁড়াবার সুযোগও পেল না, হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে কবরের ওপর। যারা থমকে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, তারা পিছন থেকে সুলতান আইয়ুবীর ধাওয়াকারী অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হলো।

মুজাফফরুদ্দিনের আক্রমণকারী বাহিনী আইয়ুবীর বাহিনীর ধাওয়া খেয়ে কবরের ওপর দিয়েই ছুটতে আরম্ভ করলো। কবর টপকে এগুতে গিয়ে তাদের অনেকেই পড়ে গেল কবরের ভেতর। সেখান থেকে তারা উঠে আসার আগেই তাতে

পড়লো আরো সৈন্য। এভাবে নিজের সৈন্যদের চাপে পড়ে ইহলীলা সাঙ্গ হলো অনেক সৈন্যের।

মুজাফফরুদ্দিন ভীত হওয়ার পাত্র ছিলো না। সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীতে থাকতেও অল্প সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা তার ছিল। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মুজাফফরুদ্দিন রুখে দাঁড়িয়ে তার অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে পাল্টা আঘাত হানলো আইয়ুবীর বাহিনীর ওপর। তারা তরঙ্গের মত ছুটে গেল আইয়ুবীর ঘেরাওকারী বাহিনীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সুলতান আইয়ুবী তার অশ্বারোহীদের থামিয়ে দিলেন, ইশারা করলেন তাদেরকে ময়দান ছেড়ে দিতে। তারা তাই করলো এবং মুজাফফরুদ্দিনের বাহিনীকে ময়দানে রেখে দ্রুত সরে গেল সুবিধাজনক পাশে। এই ফাঁকে আবার তাদের ওপর শুরু হলো তীর বর্ষণ।

তারা নিজেদের সামাল দেয়ার সুযোগও পেল না। তীরের আঘাতে একে একে লুটিয়ে পড়তে লাগলো ময়দানে।

অবস্থা বেগতিক দেখে মুজাফফরুদ্দিনও ময়দান ছেড়ে পাশে দণ্ডায়মান অশ্বারোহী বাহিনীর ওপর টুটে পড়লো। যুদ্ধ চলে গেল হাতাহাতির পর্যায়ে। সুলতান আইয়ুবীর তীরন্দাজ বাহিনীর তীর বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ ময়দানে উভয় বাহিনীর যোদ্ধারা একাকার হয়ে পড়েছিল। উভয় বাহিনীর এ মারমুখী লড়াইয়ের কারণে যুদ্ধের অবস্থা বড় করুণ হয়ে উঠলো। সুলতান আইয়ুবী কাসেদ মারফত রিজার্ভ বাহিনীকে ময়দানে তলব করলেন। সাথে সাথে সংরক্ষিত রিজার্ভ

বাহিনীও ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

মুজাফফরুদ্দিনের সমস্য হলো, সে কোন সাহায্য পাচ্ছিল না। তারপরও বীরের মত লড়ে যাচ্ছিল মুজাফফরুদ্দিন ও তার বাহিনী। বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়লো যুদ্ধ। সন্ধ্যা পর্যন্ত চললো এ মরণপণ লড়াই। সুলতান আইয়ুবী কাসেদ মারফত যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। নিজেও ছুটাছুটি করে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

সন্ধ্যা। সুলতান আইয়ুবীর রিজার্ভ বাহিনীর প্রবল আক্রমণের ফলে মুজাফফরুদ্দিনের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে দাঁড়ালো যে, ময়দান থেকে বের হওয়ারও কোন পথ খুঁজে পেল না সে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত দুই বাহিনীর রক্তাক্ত সমর চললো। যুদ্ধের কমাণ্ড সুলতান আইয়ুবীর হাতে ছিল বলেই বাঁচা নতুবা অবস্থার বিপর্যয় ঘটে যেতে পারতো। মুজাফফরুদ্দিন তার চুড়ান্ত যোগ্যতা প্রদর্শন করে উস্তাদের সাথে যুদ্ধ করলো। সুলতান আইয়ুবীর শিখানো যুদ্ধের সকল কলা-কৌশল প্রদর্শন করে লড়াই করলো সে, কিন্তু পরাজয় রোধ করতে পারলো না শুধুমাত্র বাইরে থেকে কোন সাহায্য না পাওয়ায়।

বাজীতে হেরে গেলো মুজাফফরুদ্দিন। এ যুদ্ধেও সুলতান আইয়ুবী অনেক যুদ্ধবন্দী আটক করলেন। মুজাফফরুদ্দিনের এক উপদেষ্টা ফখরুদ্দিন, তাকেও যুদ্ধবন্দী হিসাবে হাজির করা হলো সুলতানের সামনে। এই ফখরুদ্দিন যেনতেন লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাইফুদ্দিনের

প্রধানমন্ত্রী।

তুর্কমানের যুদ্ধে যখন সাইফুদ্দিন পলায়ন করে, তখন ফখরুদ্দিন মুজাফফরুদ্দিনের কাছে চলে যায় ও তাকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে থাকে। সুলতান আইয়ুবীর ওপর এ আক্রমণ চালানোর অন্যতম উস্কানিদাতা ছিল এই ফখরুদ্দিন।

এই যুদ্ধ ১১৭৬ সালের এপ্রিল মাস, মুতাবেক হিজরী ৫৭১ সালের সওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে মুজাফফরুদ্দিনের চরম পরাজয় ঘটেছিল। সুলতান আইয়ুবী বলতে গেলে এ যুদ্ধেই নামধারী মুসলিম শত্রুদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধে সুলতান আইয়ুবীরও এত বেশী ক্ষতি হয়েছিল যে, যুদ্ধপরবর্তী দুই মাস তিনি তুর্কমান সমরাঙ্গণ থেকে বের হতে পারেননি। তার দক্ষিণ বাহিনী শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাতে তার নিজের দক্ষিণ হস্তই যেন ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তিনি নতুন সৈন্য ভর্তি শুরু করলেন।

সাথে সাথে তিনি মিশর ও দামেস্কে কাসেদ পাঠালেন সামরিক সাহায্য চেয়ে। যদি তার এত বেশী ক্ষতি না হতো, তবে তিনি বিলম্ব না করে হলব, মুশেল ও হারানের ওপর আক্রমণ চালাতেন। আর তিনি যদি তেমন আক্রমণ চালাতে পারতেন তবে ফিলিস্তিনের পথে অগ্রাভিযানে যেসব মুসলমান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, অচিরেই তিনি তাদের সঠিক পথে আনতে পারতেন অথবা তাদের সব সামরিক শক্তি নিঃশেষ

করে দিতে পারতেন।

'এই বিজয় আমার বিজয় নয়!' যুদ্ধ অবসানের পর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তার সেনাপতিদের বলছিলেন, 'এই বিজয় আসলে খৃস্টানদের বিজয়! তারা আমাদের দুর্বল করতে চায়, তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তারা আমার অগ্রাভিযানের গতি দুর্বল করে ফিলিস্তিনের উপরে তাদের আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়, তাদের এ উদ্দেশ্যও সফল হয়েছে এ যুদ্ধে। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন আমাদের মুসলমান ভাইয়েরা বুঝবে, কাফেররা কোনদিন মুসলমানের বন্ধু হতে পারে না। যখন তারা মুসলমানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন বুঝতে হবে, এই বন্ধুত্বের মধ্যেও লুকিয়ে আছে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র। আমি বলতে পারি না, ইতিহাস লেখার সময় ঐতিহাসিকরা আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য কি লিখবেন। তারা যদি লেখেন, মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই শেষ হয়ে গেছে তাহলে তা খণ্ডনের কোন ভাষা নেই আমাদের।'

সুলতান আইয়ুবী যখন তার মুসলমান ভাইদের জন্য এই দরদ ও আবেগ প্রকাশ করছিলেন, সে সময় তার অজ্ঞাতে তার সেই সব মুসলমান ভাইয়েরা ষড়যন্ত্রের নতুন এক ছক তৈরী করছিল। যারা তুর্কমানের অদূরে সংঘটিত সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা তাকে হত্যা করার নতুন পরিকল্পনা তৈরী করছিল। এই পরিকল্পনায় শামিল হয়েছিল গুমাস্তগীন ও গুপ্তহত্যাকারী দলের সরদার শেখ মান্নান।

সে সময় শেখ মান্নান আছিয়াত নামক এক কেল্লায় অবস্থান করছিলো। তাকে এ কেল্লা উপহার দিয়েছিল খৃস্টানরা। শেখ মান্নান খৃস্টানদের কাছ থেকে এ কেল্লা উপহার পাওয়ার পর সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা তার গুপ্তঘাতক দলের সদস্যদের এনে জড়ো করে এ কেল্লায়। তারপর সেখানে চলতে থাকে তাদের নানা রকম প্রশিক্ষণ। এসব প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, যে কোন ভাবে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করা।

০

আসিয়াত ও তুর্কমান অঞ্চলের মাঝামাঝি এক বিশাল মরুভূমি। মরুভূমি না বলে তাকে দুনিয়ার জাহান্নাম বলাই ভাল। সুলতান আইয়ুবীর চার কমাণ্ডো সৈন্য রাস্তা ভুলে চলে এসেছিল এই মরু-জাহান্নামে।

সূর্য দিগন্তের পাড়ে হেলে পড়েছিল। কমাণ্ডো নেতা আন নাসেরের ঘুম ভাঙলো পড়ন্ত বেলায়। শুয়ে থেকেই চোখ খুললো কমাণ্ডো নেতা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার দুঃসহ সফরের কথা। দ্রুত সে উঠে বসলো এবং চারদিকে তাকালো। দেখলো, মেয়ে দু'জন তখনো তেমনি বসে আছে। আন নাসেরের মনে পুরোনো ভয় আবার জেগে উঠলো।

মেয়েদের একজন বললো, 'ঘুম কেমন হলো?'

'ভালো।'

'এখন কি ক্লান্তি কিছুটা কমেছে?'

'হ্যাঁ, এখন আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ। সফর করতে

তেমন কষ্ট হবে না আর।'

মেয়েরা তার সাথে এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছিলো, আন নাসের অনুভব করলো, মেয়েরা তাদের সাথে কোন দুর্ব্যবহার করবে না। তবুও আন নাসেরের ভয় গেল না। কারণ তখনও সে তাদেরকে মানুষ নয়, জ্বীন ভাবছিল। এদের সাথে কথাবার্তা ও আচরণে তাই সে সাবধানতা অবলম্বন করছিল।

'ওদেরকে জাগাও।' আন নাসেরের সঙ্গীদের দিকে ইশারা করে বললো মেয়েদের একজন, 'আমাদেরকে বহু দূর যেতে হবে।'

'আমাদেরকে কি তোমাদের সঙ্গে নেবে, নাকি আমাদের ফেলে চলে যাবে তোমরা?' আন নাসের চিন্তান্বিত মনে প্রশ্ন করলো।

'তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে যাবে!' মেয়েটি উত্তর দিল, 'আমাদের ছাড়া তোমরা সঠিক পথ খুঁজে পাবে না।'

আন নাসের সাথীদের জাগালো। বড় মেয়েটি সঙ্গের মেয়েটিকে কিছু বললো। সে উঠে দাঁড়ালো এবং ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল। সে ঘোড়ার সাথে বাঁধা থলি থেকে কিছু বের করলো এবং পানির মশক খুলে নিচে নামিয়ে আনলো। তারপর মশকের মুখ খুলে থলি থেকে বের করা জিনিস তাতে ঢেলে দিল। এবার সে মশক ভাল করে ঝাঁকিয়ে কমাণ্ডোদের কাছে নিয়ে এলো। মশকটি আন নাসেরর হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললো, 'সঙ্গীদের নিয়ে পানিটুকু পান করে নাও। কারণ সফরের সময় আর পানি পাবে না।'

বড় মেয়েটা তাদের কিছু শুকনো খাবার দিল। আন নাসের ও তার সাথীরা সেই খাবার খেয়ে সবাই পানি পান করে নিল।

ওরা যখন খাওয়া দাওয়া সারছিল, সেই ফাঁকে মেয়েরা তাদের ব্যাগ ও মশক গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়ার জ্বীনের সাথে বাঁধলো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিলো। মেয়েরা তাদের তাড়া দিল, 'কই, চলো।'

ওরা চলতে শুরু করলো। একটু পরেই নেমে এলো রাতের আঁধার। আকাশে জ্বলে উঠলো লাখো-কোটি তারার আলো। একটু পর চাঁদও উঠলো। মরুভূমিতে এমনিতেই আঁধার গাঢ় হয় না, এই তারার আলো ও চাঁদের জোসনায় অন্ধকার একেবারেই ফিকে হয়ে উঠলো। কোমল জোসনা ছড়িয়ে পড়লো দিগন্ত বিস্তৃত চরাচরে।

ওরা হাঁটছিল স্বাভাবিক গতিতে। বড় মেয়েটি তার ঘোড়া আন নাসেরের কাছাকাছি নিয়ে বললো, 'তোমরা তো এই স্থানকেই জাহান্নাম বলছিলে?'

'না, না, কি বলছো তুমি!' আন নাসের উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, 'এখানে তো দেখছি চারদিকে সবুজ মাঠ। অবারিত ঘাসের সমাহার। শান্ত শীতল সমীরণ। চাঁদের মায়াবী জোসনা। এ তো জাহান্নাম নয়, জান্নাতের বাগান! তুমি কেমন করে এত শীঘ্রই এমন মনোরম জায়গায় নিয়ে এলে আমাদের?'

তার তিন সঙ্গীও অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছিল এদিক-ওদিক।

'তোমরাও কি সবাই এ সবুজ মাঠ দেখতে পাচ্ছো?' কমাণ্ডোদের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা তো আদিগন্ত সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে অনেক আগে থেকেই পথ চলছি।' একজন বললো। বাকীরাও উৎফুল্ল কণ্ঠে সায় জানালো এ কথায়।

'তোমরা তো আমাদের প্রাণটা নিয়ে নিবে না? এ কি সত্যি, নাকি ধোঁকা? নাকি আমাদের হত্যা করার আগে অলীক মায়ার রাজ্যে নিয়ে এসেছো আমাদের?' অপরজন বললো, 'তোমরা জ্বীন জাতির মেয়ে, তোমাদের পক্ষে তো সবই করা সম্ভব!'

'না!' মেয়েটি হেসে বললো, 'আমরা তোমাদেরকে এর চেয়ে অধিক সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

বড় মেয়েটি আন নাসেরকে বললো, 'এসো এখানে কিছুক্ষণ বসি।'

ওরা থেমে গেল এবং মখমলের মত কোমল ঘাসের ওপর বসে পড়লো সবাই। বড় মেয়েটি আন নাসের ও তার এক সাথীকে বললো, 'তোমরা আমার চোখের দিকে তাকাও।'

অন্য মেয়েটিও আন নাসেরের দুই সাথীকে সামনাসামনি বসিয়ে তাদেরকে বললো, 'তোমরাও আমার চোখের দিকে তাকাও।'

চারজন কমাণ্ডো সৈন্য অনুগত ভৃত্যের মত সে হুকুম

তামিল করলো। তারা পাশাপাশি বসে তাকালো দুই মেয়ের চোখে। মেয়েরা তখন সুমিষ্ট সুরে ওদের বলছিল, 'এই তোমাদের বেহেশত! এখানকার ফুলের সৌন্দর্য দেখো, এগুলোর ঘ্রাণ নাও। দেখো, কি সুন্দর ছোট ছোট পাখিরা উড়ছে এ ফুলের বাগানে। তাদের কিচির মিচির আওয়াজ কতই না সুন্দর! এ সবই তোমাদের পুরস্কার। তোমাদের পদতলে মখমলের মত নরম কোমল ঘাস। তাকিয়ে দেখো, পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝরনাধারা! কি স্বচ্ছ সেই পানি, পান করে দেখো, এ পানি কত সুমিষ্ট! এসবই তোমাদের জন্য। তোমাদের মহৎ কর্ম ও চিন্তার বিনিময়ে আল্লাহ এ সব পাঠিয়েছেন তোমাদের জন্য।'

মেয়েদের সেই সুরেলা কণ্ঠের যাদু চার জনের জ্ঞান ও বুদ্ধির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করছিল। তারা ভাবছিল, সত্যি তারা বেহেশতে চলে এসেছে। এরা মানুষও নয়, জ্বীনও নয়, এরা সেই বেহেশতের হুর, যাদের কথা আল্লাহ কোরআনে বার বার উল্লেখ করেছেন।

আন নাসের পরে হাসান বিন আব্দুল্লাহকে যে রিপোর্ট দিয়েছিল তাতে সে বলছিল, 'মেয়েদের চোখে তাকিয়ে আমি সামনে পানির স্বচ্ছ ঝর্ণা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। রঙবেরঙের ফুলে ভরা বাগান দেখতে পাচ্ছিলাম। সবুজ পাতার ফাঁকে আকর্ষণীয় ফুলের গুচ্ছ দেখে মনে হচ্ছিল অপূর্ব ও অনিন্দ্য সুন্দর এ বাগান। যে বাগানের সৌন্দর্য ও ফুলের সুষমা বর্ণনা করার মত নয়।

মেয়েদের সোনালী কেশগুচ্ছ থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল প্রাণ উতলা করা সুবাস। সেখানে আমি কোন বালি বা মাটির লম্বা টিলা দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেখানে মরুভূমির কোন ছায়াও ছিল না। সবুজ-শ্যামল বাগান, বাগানের বাহারী ফুল আর নিচে মখমলের মত ঘাসের বিছানা দেখে সত্যি আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। রঙবেরঙেরে পাখি নাচানাচি ও কিচির-মিচির করছিল সেখানে। আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি আমরা জান্নাতের বাগানে ঢুকে পড়েছি।

০

মেয়েরা আবার উঠলো। চলতে শুরু করলো কাফেলা। তারা চার জন মখমলের মত ঘাসের মধ্য দিয়ে চলতে লাগলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে তখনো বালির প্রান্তরই ছিল। কোথাও কোথাও ছিল মাটির কঠিন শিলা।

তারা চার জনই গান গাইতে গাইতে পথ চলছে। তারা যাচ্ছে পায়ে হেঁটে। মেয়েরা তাদের কয়েক গজ পিছনে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে যাচ্ছে। তাদের গতি তুর্কমানের দিকে ছিল না, যদিও কমান্ডোরা জানতো, তারা সুলতান আইয়ুবীর তুর্কমান ক্যাম্পেই যাচ্ছে। মেয়েরা এই চার কমান্ডো যুবককে তাদের অজ্ঞাতে তাদের লক্ষ্যস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আছিয়াতের কেল্লার দিকে।. সেখানে ফেদাইনের গুপ্তঘাতক দলের সরদার শেখ মান্নান থাকে।

আন নাসের ও তার সাথীদের কিছুই জানা ছিল না, তারা

কোথায় যাচ্ছে। তাদের অনুভূতি ও বিবেক বুদ্ধি মরে গিয়েছিল। তারা যাচ্ছিল না, বরং বলা যায় তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তাদের পিছনে মেয়ে দু'টি পরস্পর কথা বলতে বলতে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের কথা ঐ কমাণ্ডোদের কান পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না।

'তুমি তো বললে, রাতে আর কোথাও থামবে না।' ছোট মেয়েটি বড়টিকে জিজ্ঞেস করলো, 'এ চার জন কি পায়ে হেঁটে সারা রাত পথ চলতে পারবে?'

'তুমি পানিতে যে পরিমাণ হাশিশ মিশিয়েছো, তার প্রভাব আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবে।' বড় মেয়েটি বললো, 'আর আমি যা খাইয়েছি তাও তুমি দেখেছো। ওদের সম্পর্কে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আশা করি সকাল হতে হতেই আমরা আছিয়াত পৌঁছে যাবো।'

'আমি তো তাদের দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।' ছোট মেয়েটি বললো, 'এটা তোমারই কৃতিত্ব যে, তুমি তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছো।'

'মুসলমানরা জ্বীন জাতিতে বিশ্বাস করে।'

'আর সে জ্বীনকে ওরা ভয়ও করে। তুমি তাদের মনে সে ভয় ভাল মতই ঢুকিয়ে দিয়েছো।'

'এটা শুধু বুদ্ধির খেলা।' বড় মেয়েটি বললো, 'আমি তাদের মুখ ও চাল-চলন দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, এরা সুলতান আইয়ুবীর সামরিক বিভাগের লোক। তারা ভুলে

এদিকে এসে পড়েছে। আমি তাদের দেখে আরও বুঝেছি, ওরা চারজনই আমাদের দেখে ভয় পেয়েছে। ভেবেছে, আমরা জ্বীন জাতির কেউ। যদি আমরা তাদের সে ভয় দূর করে দিতাম এবং আমরা যে মেয়ে এ কথা তাদের সামনে প্রকাশ করে দিতাম, তবে ওরা আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো, সারা জীবন যে কথা মনে রাখতে হতো। এমন নির্জন এলাকায় আমাদের মত যুবতী মেয়েকে কেউ তাদের বোন ও বেটি মনে করবে না। আমি তাদের শারীরিক অবস্থা দেখেছি, এমন সুঠাম শরীর কোন সাধারণ মানুষের হয় না। এমনকি সাধারণ যোদ্ধারাও তাদের মত এমন সুপুরুষ ও বীর হয় না। কমাণ্ডোদের বাহুতে যে অমিত তেজ ও বলিষ্ঠতা থাকে, সেই বলিষ্ঠতা আছে ওদের প্রত্যেকের মধ্যে। তাই আমি এই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছি। এই মুসলমান কমাণ্ডোদের বুঝিয়েছি, আমরা কোরআনে বর্ণিত সেই জ্বীন, মানুষ বিপদে পড়লে যাদের আল্লাহ সাহায্যের জন্য পাঠায়।'

'ভালই করেছো। মরুভূমির এই জাহান্নামে আমাদের মত রূপসী মেয়েরা আসতে পারে, এটা তাদের বিবেক বুদ্ধিতে আসার মত বিষয় নয়। প্রথমে তারা আমাদেরকে মরুভূমির কুহেলিকা ও ধাঁধাঁ মনে করেছিল। পরে তোমার সাথে আলাপ করে তাদের মনে হয়েছে আমরা জ্বীন। আর এ বিশ্বাসকে তুমি ভালই কাজে লাগিয়েছো।'

'মানুষের বিশ্বাস ও আবেগকে কাজে লাগানোর কৌশল জানতে হয়। তুই ছেমড়ি এখনো কিছুই শিখলি না। আমি

তাদের সঙ্গে যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলেছি, তাতে তারা সন্দেহাতীতভাবেই বিশ্বাস করেছে, আমরা জ্বীন। কারণ আমি তাদের আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে জানি। তোকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।'

'আর শিখেছি! আমার এসব ভাল লাগে না।'

'বলিস কি! এটাই তো এ লাইনের বড় পুঁজি। আমি তো এখন সাইফুদ্দিনের মত চালাক লোককেও ইশারায় নাচাতে পারি। আর এগুলো তো গোবেচারা সাধারণ সিপাহী।'

'আসলেও তোমার কাছ থেকে আমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে।' ছোট মেয়েটি বললো, 'কিন্তু আমার যে এসব ভাল লাগে না। মানুষের সাথে প্রতারণা ও ছল-চাতুরী করতে মন চায় না আমার।'

'তবুও এ চেষ্টা তোকে করতেই হবে।' বড় মেয়েটি বললো, 'তোকে এ সব পুরুষের খেলনা হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে হবে। শোন, তুই এই রাস্তায় প্রথম নেমেছিস তো, তাই কায়দা কৌশল এখনো সব রপ্ত করতে পারিসনি। এভাবে পুতুল সেজে বসে থাকলে তুই ক্রুশের কোন কাজই করতে পারবি না। নিজের দেহটাকে অল্প বয়সেই বৃদ্ধা বানিয়ে নিলে পুরুষরা তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বাইরে।'

'তাহলে আমাকে কি করতে হবে?'

'শোন, মুসলমান আমীর ও শাসকদের শুধু আনন্দ দান করাই তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ওদের ভোগের সামগ্রী হয়ে থাকার জন্য আমরা এ পথে নামিনি। আমাদের কাজ ওদের

বিবেক বুদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করা। ওদের দীল-দেমাগ থেকে ঈমানের আলো সরিয়ে দেয়া।'

'কিন্তু এটা তো খুবই কঠিন কাজ?'

'আরে, বোকা মেয়ে বলে কি? এটা তেমন কোন কঠিন কাজই না। তুই নিজের চোখেই তো দেখলি, আমি কত সহজে ও তাড়াতাড়ি তাদেরকে আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিলাম।'

'তুমি সত্যি যাদু জানো।' বললো ছোট মেয়েটি।

'না, এখানে যাদুর কিছু নেই, সামান্য ট্রেনিংয়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের খৃস্টান ও ইহুদী ওস্তাদরা শিখিয়ে পড়িয়ে আমাদের এভাবে তৈরি করেছে। আমি এই চার জনকে ঘায়েল করার জন্য সেই কথাই বলেছিলাম, যে কথা আমার ওস্তাদ শিখিয়ে ছিলেন। সে শিক্ষা হলো, মানুষ সর্বদা ভোগের লালসা করে। আমাদের কাজ হলো, মুসলমানদের মধ্যে এই মজা বা ভোগের লালসা বাড়িয়ে দেয়া। কারণ এই দুর্বলতা মানুষকে ধ্বংসের দিকে টেনে নামায়। তাই আমি ওদেরকে স্বপ্নের সুন্দর রাজ্য দেখিয়েছি।'

'এই লালসা কি শুধু মুসলমানদেরই আছে, অন্য কারো নেই?'

'এই লালসা মানুষ মাত্রই আছে। কিন্তু আমাদের কাজ মুসলমানদের দুর্বল করা আর নিজের জাতির লোকদেরকে জাতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা। কেন, তোমার কি সে রাতের কথা মনে নেই, সাইফুদ্দিন যখন আমাদের সামনে তার এক সেনাপতিকে বললেন, তিনি সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে

একটা আপোস রফা করতে চান। আমি এক রাতেই তার সে দুর্বলতা দূর করে দিয়েছিলাম। সে রাতেই আমি তার এ চিন্তা ও পরিকল্পনা বাতিল করিয়ে তাকে আইয়ুবীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সংকল্প যুগিয়েছিলাম।'

'আগে আছিয়াত পৌঁছতে দাও, তারপর তোমার এসব ওস্তাদী কৌশল আমাকেও শিখিয়ে দিও।' ছোট মেয়েটা বললো, 'বুঝতে পারছি, এই কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে লাভ নেই। আমি আসলেই মুসলমান আমীরদের খেলনার বস্তু হয়ে গেছি। তুমি তোমার সম্মান রক্ষা করে চলতে পারো, কিন্তু আমি পারি না। কখনও কখনও পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোন পথ খুঁজে পাই না। এমন কোন আশ্রয়ও খুঁজে পাই না, যেখানে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে পারবো।'

'আরে মেয়ে, পালিয়ে গিয়ে বাঁচার দরকার হবে না। যে দিন সব কিছু শিখে যাবে, সে দিন দুনিয়া থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়!' বড় মেয়েটা বললো, 'তোমাকে এই প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যই তো আমার সাথে পাঠানো হয়েছে। আমি তোমার মাঝে যেসব দুর্বলতা লক্ষ্য করেছি, সে দুর্বলতা দু'দিনেই দূর হয়ে যাবে।'

আন নাসের মেয়েদের আগে আগে তার সাথীদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে পথের নিশানা ঠিক আছে কিনা জেনে নিচ্ছে মেয়েদের কাছ থেকে।

বড় মেয়েটি বললো, 'পথ হারানোর কোন ভয় নেই

তোমাদের। আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি।'

'পেছনে না থেকে তোমরাই সামনে চলো না কেন, তাতে আমাদের পথ হারাবার কোন ভয় থাকে না!'

মেয়েরা ঘোড়া সামনে নিয়ে গেল। কমাণ্ডোরা নিশ্চিন্ত মনে তাদের অনুসরণ করতে লাগলো।

রাত আরও গভীর হলো। আইয়ুবীর চার জানবাজ কমাণ্ডো এক সাথে গান গাইতে গাইতে পথ চলছে। কোন রকম দুঃখ, শোক, কষ্টই যেন তাদের স্পর্শ করতে পারছে না। পায়ের নিচের বালি, মাটি ও পাথর তাদের কাছে মনে হচ্ছিল পুষ্পিত উদ্যানের সবুজ সতেজ ঘাসের মখমল।

ছোট মেয়েটি বললো, 'এদেরকে আছিয়াত নিয়ে গিয়ে কি করবে?'

'আমাদের ওস্তাদ শেখ মান্নানের কাছে এর চেয়ে বড় উপহার আর কিছু নেই।' বড় মেয়েটি উত্তর দিল, 'এরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর গোয়েন্দা! তুমি জানো না, উস্তাদের কাছে এদের মূল্য কত! আমাকে বিশেষভাবে তিনি জানিয়েছেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর একটা গোয়েন্দা ধরা এক হাজার সৈন্য হত্যার চেয়েও বেশী। কারণ এক হাজার সৈন্য হত্যা করলে নতুন সৈন্য ভর্তি করে তিনি সে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু একজন গোয়েন্দা উস্তাদের হাতে পড়লে তিনি এমনভাবে মগজ ধোলাই করে তাকে ফেরত পাঠাবেন, যখন সে আর আইয়ুবীর সৈন্য থাকবে না, সে হয়ে যাবে আমাদের। অথচ আইয়ুবীর বাহিনীতে তারা অবাধে বিচরণ

করতে পারবে। তাদের যে কোন গোপন খবর আমাদের সরবরাহ করতে পারবে। আমাদের হয়ে আইয়ুবীকে বা তার যে কোন জেনারেলকে গুপ্ত হত্যা করতে পারবে। আরো যে কত কিছু তাদেরকে দিয়ে করানো সম্ভব তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সে জন্য গোয়েন্দা ধরার দরকার কি, যে কোন সৈন্য ধরলেই তো হয়!'

'না, সৈন্যদের নির্দিষ্ট ব্যারাক আছে। চলাচলের নির্দিষ্ট জায়গা আছে। যখন যেখানে খুশী তারা যেতে পারে না। কিন্তু গোয়েন্দাদের কাজই হলো সংবাদ সংগ্রহ ও তা আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে দেয়া। এ জন্য তারা যত্রতত্র অবাধে বিচরণ করতে পারে। তা ছাড়া গোয়েন্দাদের আছে কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ। সুলতান আইয়ুবী তার গোয়েন্দাদের এমন কমাণ্ডো প্রশিক্ষণ দিয়ে রেখেছে, যে ট্রেনিং সেনাবাহিনীর অফিসাররাও পায় না। শক্তিতে, বীরত্বে, ক্ষীপ্রতায় তারা হয় অসাধারণ। আর মানসিক দিক দিয়ে এরা আপন কর্তব্য পালনে হয় পাগলপারা ও জানকবুল!'

'তাই তো বলি, এই চার জন সৈনিক রাতের এমন দুর্ধর্ষ আক্রমণ চালানোর পর, যুদ্ধের ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে মরুভূমির কঠিন বিপদে কিভাবে এত সময় বেঁচে রইলো? কোন মানুষের পক্ষে এমন বিপদ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করে বেঁচে থাকা যে আদৌ সম্ভব, এদের না দেখলে তা বিশ্বাসই করতাম না!'

'আমি হলপ করে বলতে পারি, আমাদের সৈন্যদের মাঝে এমন মনোবলের অধিকারী একটা সৈন্যও নেই। এই চারজনকে আমি শেখ মান্নানের হাতে তুলে দেবো। তিনি ও তার লোকেরা এদেরকে সহজেই নিজেদের মত দক্ষ বানিয়ে নিতে পারবে। তাদের এই অপরিমেয় শক্তি ও কৌশল নিজেদের কাজে লাগাতে পারবে।

তোমার হয়তো জানা নাও থাকতে পারে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য আমাদের গুপ্ত সেনারা অনেকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু একবারও সফল হতে পারেনি। এই চারজনকে হাশিশ ও নেশায় ডুবিয়ে দিয়ে তারপর ওদের ওপর প্রয়োগ করতে হবে সম্মোহনী বিদ্যা। তখন এরাই সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য পাগল হয়ে যাবে। আমাদের সৈন্যরা সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছতে অনেক বাঁধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু এদের সে সমস্যা হবে না, কারণ এরাতো তারই কমাণ্ডো সেনা।'

'কেন! সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর ওপর অন্য কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা যায় না, যেমন সাইফুদ্দিন, গুমাস্তগীনের ওপর গ্রহণ করা হয়েছে?' ছোট মেয়েটি বললো।

'না!' বড়ো মেয়েটি বললো, 'যে মানুষ লোভ-লালসা থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়, তার সামনে সোনা-দানা, হীরে-জহরত, মণি-মাণিক্য, আমাদের মত সুন্দরী নারী সবই মূল্যহীন। ভয় বা লোভ কিছু দিয়েই তাকে সত্য পথ থেকে সরানো যায় না। তাদের কাছে একমাত্র

মহামূল্যবান বস্তু হচ্ছে ঈমান। এই ঈমানী সম্পদের কোন কমতি নেই আইয়ুবীর। ফলে তাকে সম্পদ বা ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে দখল করা যাবে না।'

'তোমার মত মেয়ে দিয়েও কি তাকে জয় করা সম্ভব নয়?'

'না, তাদের ধর্মীয় বিধান মতে সে এক সাথে চার বিবি রাখতে পারে। কিন্তু আইয়ুবী এক বিবিতেই সন্তুষ্ট। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অন্য কোন নারীর কথা হয়তো সে চিন্তাও করে না। তার মন ভেজানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এই পাথরকে কিছুতেই গলানো যায়নি।

ফিলিস্তিনের ওপর আমাদের আধিপত্য চিরস্থায়ী করার পথ একটাই, সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করা।'

'এমন ব্যক্তিই তো ভাল যে এক স্ত্রীর বাধ্য থাকে।' ছোট মেয়েটা বললো, 'আমি ক্রুশের পূজারী এবং ক্রুশের কল্যাণ কামনা করি। কিন্তু মাঝে মাঝে চিন্তা করি, যদি আমি কোন এক ব্যক্তির হৃদয়ের রাণী হতে পারতাম, তবে এই দেহ মন তার হাতে সঁপে দিয়ে ধন্য মনে করতাম নিজেকে।'

'এমন ভাবালুতা ভাল নয়, এসব ব্যক্তিগত ভাবাবেগ ত্যাগ করো!' বড় মেয়েটা তাকে সাবধান করে বললো, 'তোমার সামনে সেই মহান উদ্দেশ্য রাখো, যাতে ক্রুশের বিজয় হয়। তোমার শপথের কথা চিন্তা করো, যে শপথ তুমি ক্রুশকে হাতে নিয়ে করেছিলে। আমি জানি তুমি পূর্ণ যৌবনা, ষোড়শী। এ বয়সে আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। কিন্তু ক্রুশ আমাদের

কাছে এই কোরবানী ও ত্যাগই চাচ্ছে।'

কাফেলা চলছে তো চলছেই। বিজন প্রান্তর ধরে নিশুতি রাতে এগিয়ে যাচ্ছে ছয় জনের এ ছোট্ট কাফেলা। আন নাসের ও তার সাথীরা তখনো মেয়েদের ঘোড়ার পিছনে পিছনে পথ চলছে। তারা হাঁটছে আর সুর করে গান গাইছে। কখনো অকারণে হেসে উঠছে। একজন হাসলে সে হাসি ছড়িয়ে পড়ছে অন্যদের মুখেও। তাদের সে হাসি ও আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল, কোন কষ্টকর সফর নয়, তারা বেরিয়েছে প্রমোদ ভ্রমণে।

রাত ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল ভোরের দিকে। যতই রাত বাড়ছিল, তাদের ঠিকানাও ততই নিকটবর্তী হচ্ছিল।

০

এই মেয়ে দু'টি কে, কি তাদের পরিচয়? এরা সেই জাতির মেয়ে, যাদের কাহিনী ও ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে কোরআনে। এরা সেই ইহুদী ও খৃস্টান কন্যা, মুসলমানদের ঈমান ক্রয়ের জন্য যাদের লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

ইহুদী ও খৃস্টানরা মুসলমানদের সাথে অসংখ্য সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল এই পথ। তারা তাদের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ট্রেনিং স্কুল। সেই সব স্কুল থেকে এই সব মেয়েদের শিখিয়ে দেয়া হতো, কিভাবে মুসলমানদের ঘায়েল করতে হবে। তাদেরকে সেখানে শারীরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হতো,

মানসিক প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। ওস্তাদ শিক্ষকরা তাদের শিখাতো দুস্কৃতির নানা কৌশল ও কায়দা কানুন। ওদের বলা হতো, মুসলমানদের শত্রু নয়, তোমরা ওদের সাথে মিশবে বন্ধু বেশে। এমন ভাবে মিশবে, যেন তোমরাই হয়ে ওঠো ওদের ধ্যান-জ্ঞান, স্বপ্ন ও কল্পনা। তোমরা হবে ওদের মনের মানসী। তাদেরকে ডুবিয়ে দেবে ভোগের রাজ্যে। আনন্দ-স্ফুর্তির দুনিয়ায় ওদের এমন ভাবে আটকে রাখবে, যেন জেহাদ ও যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে দূরে থাকার জন্য ওরা হাজারটা বাহানা খুঁজে বের করতে পারে।

এই ওস্তাদরা ওদের শিখাতো মুসলমানদেরকে নিজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার কৌশল। শিশুকাল থেকেই শুরু হয়ে যেতো মেয়েদের এই শিক্ষা। মুসলমানরা যে ওদের জাত শত্রু, তাদেরকে যে ঘৃণা করতে হবে, শত্রু ভাবতে হবে এটা যেমন তাদের শিখাতো তেমনি শিখাতো সেই শত্রুতা সাধনের জন্য ওদের বন্ধু হতে। তারপর সেই বন্ধু বেশে কিভাবে মুসলমানদের চিন্তা চেতনায় প্রভাব বিস্তার করা যায়, কিভাবে তাদের পরিণত করা যায় খৃস্টান ও ইহুদীদের মানসিক গোলামে, সব কিছুই শিখিয়ে দেয়া হতো ওদের।

এই মেয়েদের শেখানো হতো দুষ্টুমী ও নির্লজ্জতা। শেখানো হতো নিজেদের লোভনীয় করে উপস্থাপন করার নানা কৌশল। এদের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি বলে কিছু ছিল না, ক্রুশের জন্য ওরা সব করতে পারতো।

এই কাজে বেশী আগ্রহী ছিল ইহুদীরা। মুসলমানদেরকে

ওরা মনে করতো সবচে বড় শত্রু। তাই তাদের সুন্দরী মেয়েদেরকে পাঠিয়ে দিত এইসব প্রশিক্ষণ স্কুলে।

অবশ্য এ কাজে খৃস্টানরাও পিছিয়ে ছিল না। তারাও তাদের মেয়েদেরকে এই কাজে ব্যবহারের জন্য অকাতরে সঁপে দিত। এ ছাড়াও তারা এ কাজে ব্যবহার করতো আরো কিছু মেয়ে, যারা ছিল মুসলমান। এসব মুসলিম মেয়ে ওরা সংগ্রহ করতো অধিকৃত মুসলিম এলাকা থেকে। কখনো চুরি বা হাইজ্যাক করে, কখনো কাফেলা আক্রমণের পর লুণ্ঠন চালিয়ে তাদেরকে সংগ্রহ করতো। তারপর তাদেরকে ভুলিয়ে দিত তাদের জাতি পরিচয়। শিশুরা তো এমনিতেই ভুলে যেতো, কিন্তু যারা একটু বড় তাদেরকে ভুলানোর জন্য ব্যবহার করতো, হাশিশ বা নেশাদ্রব্য এবং ড্রাগ। এভাবেই এসব মুসলিম মেয়েকেও ওরা ব্যবহার করতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

এই দুই মেয়েকে কিছুদিন আগে খৃস্টানরা মুশেলের আমীর সাইফুদ্দিনকে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিল। সাইফুদ্দিন সুলতান আইয়ুবীর ঘোর বিরোধী এ কথা সবারই জানা। এই মেয়েদেরকে পাঠানোর উদ্দেশ্যে হলো, প্রথমত: তারা গোয়েন্দাগিরী করবে. দ্বিতীয়ত: সাইফুদ্দিন যেন কখনো ভুলেও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সাথে আপোষের চিন্তা না করে সেদিকে নজর রাখবে, তৃতীয়ত: সম্মিলিত ঐক্যফ্রেন্টের এক আমীর যেন অন্য আমীরকে বিশ্বাস না করে সে জন্য তাদেরকে পরস্পর বিরোধী বানিয়ে রাখবে। কিন্তু এই বিরোধ যেন শত্রুতায়

পর্যবসিত না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখবে।

এই কাজ যে কেবল এ দুই মেয়েই শুধু করছিল, তা নয়। মুসলমান প্রত্যেক আমীরের হেরেমেই খৃস্টানদের পাঠানো চর এভাবে নিয়োজিত ছিল।

খৃস্টানরা মুসলমানদের কয়েকজন নেতাকেও খরিদ করে নিয়েছিল এবং তাদের ঈমান-আকিদা নষ্ট করে তাদেরকে মুসলমানদের বিপক্ষেই কাজে লাগাচ্ছিল।

সাইফুদ্দিন সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে যখন তুর্কমান সমরাঙ্গণে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লড়তে যায়, তখন তৎকালীন নিয়ম অনুসারে তার মহলের সেরা সুন্দরীদের সঙ্গে নেয় নাচগান ও স্ফূর্তির জন্য। এই দুই খৃস্টান মেয়েও সঙ্গে ছিল তার এ অভিযানে।

সাইফুদ্দিন জানতো, এরা মুসলমান ও অভিজাত ঘরের মেয়ে। যুদ্ধে তাদের কাফেলা লুট হয় এবং তারা ধরা পড়ে খৃস্টানদের হাতে। পরে খৃস্টানরা তাদেরকে উপহার হিসাবে পাঠিয়ে দেয় সাইফুদ্দিনের কাছে। এরা খুব সরল সহজ ও ভদ্র মেয়ে, যদিও বড় মেয়েটা যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও কর্তৃত্বশীলা।

এদিকে বড় মেয়েটার অবস্থা ছিল, সে সাইফুদ্দিনের পিছনে সব সময় ছায়ার মত লেগে থাকতো। মহলের সকল মেয়েদেরকে সে দাসী-বাদী বানিয়ে রেখেছিল। সাইফুদ্দিন তাকে নিজের কল্যাণকামী মনে করতো এবং এ জন্য মহলে তার এ আধিপত্য বিস্তারে তার কোন রকম দুশ্চিন্তা বা মাথাব্যথা ছিল না।

সাইফুদ্দিনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, নইলে এমন ঝড় তুফানে সে পড়বে কেন, যে ঝড়ের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই যে ঝড় তার বাহিনীকে তছনছ করে দিয়েছিল।

এই ঝড়ের মধ্যেই ফৌজি নামের এক মেয়ে ঘোড়ার পিঠে করে নিজের ভাইয়ের লাশ নিয়ে হাজির হয়েছিল সুলতান আইয়ুবীর ক্যাম্পে। সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রবল আক্রমণ আসছে, এ খবর সে-ই সুলতানকে জানিয়েছিল। তার এ ছোট্ট একটা খবরই বলতে গেলে তুর্কমানের যুদ্ধে সুলতান আইয়ুবীর বিজয়ের জামিন হয়েছিল।

সুলতান আইয়ুবী ফৌজির কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর আর কালবিলম্ব করেননি। তিনি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন যেখানে দুশমন অপেক্ষা করছে, সেখানে। ফৌজির খবরের কারণেই দুশমন হামলা করার আগেই তিনি তাদের ওপর চড়াও হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাইফুদ্দিন এ অতর্কিত হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এ জন্যই সাইফুদ্দিনের বাহিনী সহজে ধরাশায়ী হয়। অতর্কিত হামলার ফলে অনেক সৈনিক বলতে গেলে নিজের অজ্ঞাতেই মারা পড়ে ও বন্দী হয়ে যায়। ফলে যুদ্ধটা একতরফা ভাবেই শেষ হয়।

যুদ্ধের ময়দান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর নিয়ন্ত্রণে। খৃস্টান এই দুই মেয়ে দেখলো, সাইফুদ্দিন ও তার সম্মিলিত বাহিনী চরম মার খাচ্ছে আইয়ুবীর বাহিনীর হাতে। যুদ্ধের যা গতি

তাতে সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় অনিবার্য। এ অবস্থা দেখে তারা প্রমাদ গুণলো এবং সমরাঙ্গণ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে লাগলো।

এরা নিঃসঙ্গ ছিল না। খৃস্টানদের তাবেদার কিছু মুসলমান এজেন্ট সাইফুদ্দিনের উচ্চ পদে নিয়োজিত ছিল। এই মেয়েরা সব সময় তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতো। মেয়েরা তাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতো এবং সেই তথ্য খৃস্টানদের কাছে পৌঁছে দিত।

খৃস্টানদের এ এজেন্টরা যখন দেখলো, যুদ্ধের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, সম্মিলিত বাহিনীর সামনে পিছু হটা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই, তখন তারা এই দুই মেয়েকে সেখান থেকে বের করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। কারণ তারা জানতো, খৃস্টানদের কাছে এই মেয়ে দু'টির কদর ও মূল্য কত।

সাইফুদ্দিন যুদ্ধের ময়দানে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। মহলের মেয়েরা তাঁবুর ভেতর জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। এই দুই খৃস্টান মেয়ে তাঁবুর বাইরে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে ওরা ময়দানের অবস্থা দেখছিল, এ সময় সেখানে দেখা দিল এক এজেন্ট। বললো, 'ময়দানের অবস্থা ভালো নয়। তোমাদের সরে পড়া উচিত এখান থেকে।'

'আমরাও সে কথাই ভাবছিলাম। এখনো বেরোবার মত পরিবেশ আছে, জলদি বেরিয়ে যাওয়ার একটা বিহীত-ব্যবস্থা করো।'

মেয়েরা তাঁবুর ভেতর গেল। গুছিয়ে নিল নিজেদের অপরিহার্য সামগ্রী। তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটু দূরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলো সেই এজেন্টের।

একটু পর ফিরে এলো এজেন্ট। সে তাদের দু'জনের জন্য নিয়ে এসেছে দুটো ঘোড়া। ঘোড়ার জ্বীনের সাথে পানির চারটি মশক ও দুই তিন ব্যাগ খাবার বেঁধে দিয়ে বললো, 'আর কিছু লাগবে?'

'না, শুধু এই ব্যাগটা বেঁধে দাও।'

'এতে কি আছে?'

'তেমন কিছু নয়। আমাদের সামান্য কাপড় চোপড়, অতিরিক্ত দুটো খঞ্জর ও কিছু হাশিশ।'

এ থলিটিও বেঁধে দেয়া হলো ঘোড়ার জিনের সাথে। থলিতে আরও এক ধরনের নেশার দ্রব্য ছিল, যার কোন স্বাদ গন্ধ কিছু নেই। কাউকে ধোঁকা দিয়ে পান করালে সে বুঝতে পারবে না, তাকে পানি দেয়া হয়েছে নাকি তাতে কিছু মিশানো আছে। কিন্তু এর কথা মেয়ে দুটি এজেন্টকে বললো না।

এই দু'টি নেশার জিনিস তারা সাথে নিয়েছে, যদি কোন পুরুষের হাতে ধরা পড়ে, তবে তাদেরকে এসব পান করিয়ে যেন নিজেদের রক্ষা করতে পারে।

রাতের আঁধারে যুদ্ধের ময়দানে যখন রক্তাক্ত যুদ্ধ চলছে, তখন সেই এজেন্ট মেয়ে দুটিকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে তুর্কমান রণাঙ্গণ থেকে বহু দূরে নিয়ে এলো। তারপর তাদের খুব ভাল করে বুঝিয়ে বললো, কোন পথে তারা দ্রুত আছিয়াত

ফিরে যেতে পারবে। মেয়েদেরকে আছিয়াত দুর্গের পথ দেখিয়ে সে সেখান থেকে ফিরে এলো।

রাতের আঁধারে দুই মেয়ে রওনা করলো আছিয়াত দুর্গে। বড় মেয়েটি বুদ্ধিমতী, কৌশলী ও বীরঙ্গণা। সে ছোট মেয়েটাকে সাহস দিয়ে বললো, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি আছিয়াতের পথ চিনি।'

সকাল হওয়ার আগেই তারা সবুজ শ্যামল এলাকা পেরিয়ে কঠিন শীলাময় অঞ্চলে প্রবেশ করলো। তারপর তারা ঢুকলো সেই এলাকায়, যে অঞ্চলকে পৃথিবীর জাহান্নাম বলা হয়। এলাকাটি ছিল কঠিন শিলাময় ও শুষ্ক মরুভূমি। এ ভয়ংকর মরু অঞ্চল পার হওয়ার জন্য তারা দ্রুত ঘোড়া ছুটালো। কিন্তু একটু পরই সূর্যের উত্তাপ অসহনীয় হয়ে উঠলো এবং বাতাস ক্রমে তন্দুরের মত গরম হতে লাগলো। সূর্য যখন মাথার ওপর এলো, তখন তারা একটি উপত্যকা দেখতে পেল। এ উপত্যকায় পাহাড়ের ঢালে আশ্রয় নেয়ার জন্য তারা আরো দ্রুত ঘোড়া ছুটালো এবং এক সময় সেখানে গিয়ে পৌঁছলো।

এখানে ভিতরের দিকে আশ্রয়ের মত প্রশস্ত জায়গা ছিল। তারা সেই ছায়াঘন পাহাড়ের ঢালে আশ্রয়ের জন্য থেমে গেল।

ওখানে তারা আহার ও পানি পান করে বিশ্রাম করছে, এ সময় তাদের নজরে পড়লো আন নাসের ও তার সাথীরা।

এদের দেখেই বড় মেয়েটি বুঝতে পারলো, এরা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

তার প্রশিক্ষণ অনুযায়ী সে সফল অভিনয় শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত তার অভিনয় সফল প্রমাণিত হলো এবং আন নাসের ও তার সাথীরা তাদেরকে জ্বীন ভেবে ভীত হয়ে পড়লো।

মেয়েটা প্রথমে তাদেরকে হাতিয়ার ত্যাগে বাধ্য করলো এবং তারপর তাদেরকে পানি পান করতে দিলো। পানি পান ও আহার করানোর পর সে ওদেরকে ফেদাইন গুপ্তঘাতকদের আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের নেশার দ্রব্য পান করালো পানির সাথে মিশিয়ে।

তাদেরকে নেশায় মাতাল করার পর মেয়েরা এবার তাদের সম্মোহন করলো। তাদের চোখের সামনে মেলে ধরলো ফুল বাগান, সবুজ মাঠ, পাখির কিচির মিচির শব্দ আর গালিচার মত নরম ঘাসের বিছানা। তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে নতুন এক স্বপ্ন-জগত, যে জগতের দৃশ্য তাদের মনে জান্নাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিল।

এটা ছিল হাসান বিন সাব্বাহর এক বিশেষ আবিষ্কার। লোকদের হাশিশ ও নেশাদ্রব্য পান করিয়ে তাদের মনে সুন্দর ও মধুর দৃশ্য সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সে সবিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। তার মৃত্যুর পরও ফেদাইনরা এই নেশার দ্রব্যের ব্যবহার অব্যাহত রাখে।

তার মৃত্যুর একশ বছর পর শেখ মান্নান তার পদে অধিষ্ঠিত হয়। এই দল এখনো 'ফেদাইন' দল বলে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত।

বড় মেয়েটা ফেদাইনদের কাছে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ

করেছিল। কি করে মানুষকে হিপটোনাইজ করতে হয় ভাল মতই জানতো সে। লোকেরা নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হলে তাদের মনে কাল্পনিক ছবি তুলে ধরতে হয়। তখন সে সেই কাল্পনিক ছবিই চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পায়।

আন নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে হিপটোনিজম করে বশে আনার পর নিশ্চিন্ত মনে পথ চলছে মেয়েরা। কারণ তারা জানে, এদেরকে এখন তারা যেভাবে খুশি সেভাবে চালাতে পারবে।

ছোট মেয়েটি সঙ্গীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'আচ্ছা, এরা তো আমাদের জ্বীন বলে ধরেই নিয়েছিল। তাহলে শুধু শুধু এদেরকে হাশিশ পান করালে কেন?'

'তাদেরকে হাশিশ ও নেশা পান করানোর মূল উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। পুরুষ সজ্ঞানে থাকলে কখন তাদের মতিগতি কি হয় বলা মুশকিল। কোনভাবে ওরা যদি বুঝতে পারে আমরা জ্বীন নই, তাদেরই মত মানুষ তাহলে আমাদের ভোগ করার চিন্তা আসতে পারে তাদের মাথায়। আর ওরা আমাদের দিকে হাত বাড়ালে তাদের বাঁধা দেবো এমন শক্তি আমাদের নেই। তাই কোন রকম ঝুঁকি নেয়া সঙ্গত মনে করিনি আমি।

তাছাড়া যখন জানতে পারলাম, ওরা সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীর লোক, যাদের কৃতিত্বের কথা লোক মুখে বহুল প্রচারিত, তখন মনে একটু ভয়ও ঢুকে গেল। চিন্তা করে দেখলাম, এমন দুর্ধর্ষ সৈনিকদের প্রথমেই ঘায়েল না করলে

তাদের বশে আনার সুযোগ আর নাও পেতে পারি। আমি তো জানি, শেখ মান্নানের কাছে ওরা কত মূল্যবান। এমন মূল্যবান সম্পদের দখলটা একটু নিশ্চিত করলাম ওদের নেশাগ্রস্থ করে।

শেখ মান্নান এদের দিয়ে বড় ধরনের ফায়দা লুটতে পারবেন। তিনি বারবার সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেও সফল হতে পারেননি, তার সে স্বপ্ন সফল করার একটা মোক্ষম সুযোগ এসেছে আমার হাতে, ওদেরকে নেশাগ্রস্ত না করে সেই সুযোগকে কাজে লাগানোর উপায় ছিল না আমার।'

ওরা যখন মরুভূমিতে পথ চলতে চলতে এসব আলাপ করছিল, আছিয়াত কেল্লায় তখন হারানের শাসক গুমাস্তগীন শেখ মান্নানকে বলছিল, 'আরও একবার চেষ্টা করে দেখো, আইয়ুবীকে হত্যা করার কোন না কোন পথ তুমি পেয়েই যাবে।'

০ ০

তুর্কমানে মুজাফফরুদ্দিনের আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের বললেন, 'এখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে। এবার তোমরা গনিমতের মাল জমা করো।'

গনিমতের মাল অপরিমেয়! গাজী সাইফুদ্দিনের আশ্রয় ক্যাম্পে প্রচুর সোনা ও নগদ অর্থ পাওয়া গেল। শত্রু সেনাদের লাশের পোষাকেও নগদ অর্থ ও সোনার আংটি ছিল। আর

বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম ও অস্ত্রপাতিও পাওয়া গেল বেশুমার।

সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র তার সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। অন্যান্য জিনিসপত্র দামেস্কে ও কায়রোতে পাঠিয়ে দিলেন গরীবদের মধ্যে বিলি বন্টনের জন্য। কারণ মিশর ও সিরিয়া তখন একই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় অংশ পাঠিয়ে দিলেন মাদরাসা নিজামুল মুলকের জন্য। ইউরোপের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেন পল বর্ণনা করেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষা লাভ করেছিলেন।' তিনি আরও লিখেছেন, 'বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ থেকে জানা যায়, সুলতান আইয়ুবী তার নিজের জন্য গনিমতের মালের কিছুই রাখতেন না।'

গনিমতের মাল বন্টনের পর তিনি যুদ্ধবন্দীদের দিকে মনোযোগ দিলেন। এসব যুদ্ধবন্দীদের সবাই ছিল মুসলমান!

সুলতান আইয়ুবী তাদের সবাইকে এক জায়গায় একত্রিত করে বললেন, 'তোমরা সবাই মুসলমান হয়েও মুসলমানের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে এসেছো। তোমাদের পরাজয়ের কারণ তো এটাই যে, এ যুদ্ধে তোমরা জেহাদী প্রেরণা থেকে বঞ্চিত ছিলে। তোমাদের শাসক ইসলামের জঘন্যতম শত্রুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। তাই তোমাদের ভাগ্যে দুনিয়াতে জুটেছে লাঞ্ছনা, পরকালে তোমাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব ও শাস্তি। কিন্তু আল্লাহ বড় মেহেরবান। তিনি তার অপরাধী ও গোনাহগার বান্দাদের জন্য ক্ষমা ও

মাগফেরাতের দুয়ার খোলা রেখেছেন। জানিনা তোমরা তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে এলে সে ক্ষমা ও মাগফেরাত তোমাদের ভাগ্যে জুটবে কিনা। তবে আমি এটুকু বুঝি, যে পাপ তোমরা করেছো তার থেকে মুক্তির একটাই পথ খোলা আছে, আর তা হলো, তোমরা আবার ইসলামের সৈন্য হয়ে যাও এবং তোমাদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসকে মুক্ত করার জেহাদে নিজেদের নাম লেখাও।'

সুলতান আইয়ুবীর এই বক্তৃতা বন্দীদের হৃদয় ছুঁয়ে গেল। এ বক্তৃতায় বন্দীদের জন্য শাস্তির পরিবর্তে কেবল মুক্তির ঘোষণাই ধ্বনিত হয়নি, সেই সাথে তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে নিজের বাহিনীতে শামিল করার মহৎ প্রস্তাবও দিয়েছেন তিনি। সুলতানের এই ক্ষমাসুন্দর আহবানে সবাই আবেগাপ্লুত হয়ে উঠলো। তাদের মধ্যে নতুন করে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি হলো এবং তারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখর করে তুললো পুরো এলাকা।

সুলতান আইয়ুবী ঘোষণা করলেন, 'যারা জেহাদের উদ্দেশ্যে আমার বাহিনীতে শামিল হতে চাও তারা আমার সৈন্য দলে নাম লেখাও। আর যারা বাড়ি যেতে চাও মুচলেকা দিয়ে তারা চলে যেতে পারবে।'

কিন্তু দেখা গেল, কেউ বাড়ি যাওয়ার দরখাস্ত করলো না, বরং সবাই আইয়ুবীর সেনা দলে নাম লেখানোর জন্য ভীড় করলো।

এমনিভাবে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য সংখ্যা বেড়ে গেল।

এরা সবাই ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক, ফলে নতুন করে সামরিক প্রশিক্ষণ দরকার ছিল না ওদের। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'ওদেরকে আমাদের বিশেষ যুদ্ধ কৌশল শিখাতে হবে এবং মানসিক দিক দিয়ে ওদেরকে জেহাদী জযবায় উজ্জীবিত করে তুলতে হবে।'

ফলে শুরু হয়ে গেল তাদের ট্রেনিং। এ জন্য সুলতান আইয়ুবী অভিযান বন্ধ রাখলেন। সৈন্য বাহিনীকে নতুন ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার ফাঁকে তিনি দামেস্ক ও কায়রোতে খবর পাঠালেন সামরিক সাহায্য পাঠানোর। মনোযোগ দিলেন আহত সৈন্যদের চিকিৎসার দিকে। মোটের ওপর মুজাফফরুদ্দিনের সাথে সংঘর্ষে তার যে সামরিক ক্ষতি হয়েছিল তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য তিনি সর্বাত্মক পদক্ষেপ নিলেন।

০

আছিয়াত দূর্গ বর্তমান লেবাননের সীমান্তবর্তী একটি স্থান। মিশরের লেখক মুহাম্মদ ফরিদ আবু হাদীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, আছিয়াত দূর্গ ফেদাইন নেতা শেখ মান্নানের কেন্দ্রস্থল ছিল। ফেদাইন একটি গুপ্তঘাতক দল। এর মূল নেতা ছিল হাসান বিন সাব্বাহ। তার মৃত্যুর পর বিভিন্ন জন এর নেতৃত্ব দিয়েছে। এ ঘটনা যখন সংগঠিত হয় তখন এর নেতা ছিল শেখ মান্নান। ফেদাইন নেতা হিসাবে আছিয়াত দূর্গের একমাত্র কর্তৃত্ব ছিল শেখ মান্নানের হাতে। সে হাসান বিন সাব্বাহর গদীনশীন হিসাবে সারা দেশের ফেদাইন কর্মীদের

পরিচালনা করতো।

গুপ্তঘাতকদের আশ্রয়স্থল এই আছিয়াত কেল্লার সুরক্ষার জন্য সে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য মোতায়েন রেখেছিল। আছিয়াত তুলনামূলকভাবে অন্যান্য দুর্গের চেয়ে সামান্য বড় ছিল। এই দুর্গের সন্নিকটে চারপাশে আরও চারটি ছোট দুর্গ ছিল, যেগুলোকে মূলত এই দুর্গেরই সম্প্রসারিত অংশ বলা যায়।

এই চার দুর্গে অবস্থান করতো শেখ মান্নানের চার ফেদাইন সহকারী। খৃস্টানরা এ কেল্লা তাদেরকে দান করেছিল সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে তাদের বার বার অভিযানের পুরস্কার হিসাবে।

খৃস্টানরা চাচ্ছিল, মুসলমান নেতাদের হত্যা করার জন্য এবং মুসলিম জাতির চরিত্র হননের জন্য ফেদাইনরা যে কাজ করছে তা যেন আরও ভালভাবে করতে পারে। এই ফেদাইন গ্রুপ নিজেদেরকে ইসলামের একটি উপদল হিসেবে পরিচয় দিতো। কিন্তু খুন-খারাবীতে তারা এতটাই দক্ষতা দেখিয়েছিল যে, সমাজে তারা শুধু ভাড়াটে খুনীচক্র হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে।

ভাড়াটে খুনী হিসাবে খুনের ক্ষেত্রে তারা কোন বাছবিছার করতো না। ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃস্টান নেতাদেরও তারা খুন করেছে। অগ্রিম অর্থ দিয়ে তাদেরকে এই কাজে ব্যবহার করতো লোকেরা।

সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য এদের ভাড়া

করেছিল খৃস্টানরা। একাধিকবার তারা সুলতানকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিবারই তিনি বেঁচে গেছেন অল্পের জন্য। আইয়ুবীকে হত্যা করার জন্য খৃস্টানরা এদেরকে বহু রকম সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। এমনকি কেল্লাও দান করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, তারা নূরুদ্দিন জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করবে।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আকবার খান বিভিন্ন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 'নূরুদ্দিন জঙ্গীর মৃত্যুর পেছনে ফেদাইন দলের হাত ছিল। তারাই তাকে ধোঁকা দিয়ে সিরাপের সাথে এমন বিষ পান করিয়েছিল, যা ক্রমে ক্রমে তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ করেছিল। লোকে জানে, তিনি কয়েকদিন গলার ব্যথায় ভুগে মারা যান। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, গলার ব্যথার যে ঔষধ তাকে দেয়া হয়েছিল, সেই ঔষধে গোপনে ফেদাইন গুপ্তঘাতকরা সেই বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল'।

এখন খৃস্টান এবং খৃস্টানদের দোসর সম্মিলিত বাহিনীর প্ররোচনায় তারা নতুন করে সুলতান আইয়ুবীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু করলো।

সেদিন সকাল বেলা। সূর্য তখনও উঠেনি। আন নাসের ও তার সঙ্গীদের নিয়ে দুই মেয়ে আছিয়াত দুর্গের দরোজায় এসে থামলো। বড় মেয়েটি সাংকেতিক ভাষায় কিছু বললো দুর্গ রক্ষীদের, ফটকের প্রহরীরা কেল্লার গেট খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে

এই ছোট্ট কাফেলা ঢুকে গেল কেল্লার ভিতরে।

আন নাসের ও তার সাথীদেরকে কেল্লার প্রহরীদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে মেয়ে দু'টি চলে গেল শেখ মান্নানের কাছে। শেখ মান্নান সব দিক থেকেই একজন বাদশাহর মত জীবন যাপন করতো। তার চলার ভঙ্গি, জাঁকজমক সম্পূর্ণ বাদশাহদের মতই ছিল। সে যে বুড়ো হয়ে গেছে এমন কোন অনুভূতিই তার ছিল না।

বড় মেয়েটা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, 'আমরা তুর্কমানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছি। আপনার বন্ধু সাইফুদ্দিনের ওপর কেয়ামত নেমে এসেছে।'

শেখ মান্নান মেয়েদের দিকে তাকালো। বড় মেয়েটিকে ছাপিয়ে ওর নজর পড়লো ছোট মেয়েটির দিকে। তার দিকে তাকিয়ে শেখ মান্নান বললো, 'এখানে এসো! বসো আমার কাছে।'

শেখ মান্নান বড় মেয়েকে উপেক্ষা করে ছোট মেয়েকে কাছে ডাকায় ভেতরে ভেতরে মনক্ষুন্ন হলো বড় মেয়েটি। সে কথা বন্ধ করে তাকালো সঙ্গী মেয়েটির দিকে।

'তুমি প্রয়োজনের চেয়েও বেশী সুন্দরী! আমার পাশে বসো।' মেয়েটা তার কাছে গেলে সে তার বাহু ধরে টেনে নিজের পাশে বসাতে বসাতে বললো. 'তুমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছো। আজ আমার পাশেই আরাম করবে।'

মেয়েটা শেখ মান্নানের নাম শুনলেও এই প্রথম তাকে দেখলো। সে কি বলবে, কি করবে বুঝতে পারলো না,

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তার মত বুড়ো মানুষের কাছ থেকে সে এমন আচরণ আশা করেনি।

সে একবার বড় মেয়েটিকে আবার শেখ মান্নানকে দেখতে লাগলো। শেষে সেখান থেকে উঠে সরে যেতে চাইলো শেখ মান্নানের নাগালের বাইরে। শেখ মান্নান চট করে তাকে ধরে ফেলে ঝটকা টান দিয়ে একেবারে তার কোলের কাছে টেনে নিল।

শেখ মান্নানের এ আচরণে মেয়েটি যেমন অপমান বোধ করলো, তেমনি শেখ মান্নানও অপমান বোধ করলো, মেয়েটি তাকে এড়ানোর চেষ্টা করেছে দেখে।

শেখ মান্নান বড় মেয়েটাকে বললো, 'একে আমার সম্পর্কে কেউ কিছু বলেনি? সে জানে না, আমি কে? ও আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে আমাকে অপমান করেছে। ও কি জানে না আমাকে অপমান করা কত বড় অপরাধ?'

'আমি আপনার কেনা দাসী নই!' ছোট মেয়েটি রেগে গিয়ে বললো, 'এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না যে, যে কেউ আমাকে কাছে টানলেই তাতে আমাকে সাড়া দিতে হবে।' সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, 'আমি একজন ক্রুসেডার। ক্রুশের সেবায় নিবেদিত এক দাসী। ক্রুশের জন্য আমি সব করতে পারি, কিন্তু আমি ফেদাইনদের কেনা দাসী নই যে, দায়িত্বহীনভাবে কেউ আমাকে কাছে টেনে নেবে!'

বড় মেয়েটা তাকে সাবধান করতে চাইলো। কিছুটা

ধমকের সুরেই বললো, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! কি সব আবোল তাবোল বকছিস?'

কিন্তু এ ধমকেও সে চুপ করলো না। বলতে লাগলো, 'মুসলমানদের অন্দর মহলেও এমন লোক আমি দেখেছি। আমাকে সাইফুদ্দিন ও তার উপদেষ্টাদের বিবেকের উপর পর্দা দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু যে লোক আলাপ পরিচয়ের আগেই গায়ে হাত দেয়, তেমন অভদ্রের খায়েশ মেটানো আমার দায়িত্ব নয়। আর দায়িত্ব ছাড়া শুধু শুধু এক বুড়োর সাথে এক কামরায় থাকার কোন প্রয়োজন দেখি না আমি।'

'যদি তুমি এতো বেশী সুন্দরী না হতে তবে আমি তোমার এই অপমান মোটেই সহ্য করতাম না। তোমাকে ক্ষমাও করতাম না।' শেখ মান্নান বড় মেয়েটিকে হুকুম করলো, 'এক নিয়ে যাও এবং আছিয়াত দুর্গের আদব কায়দা ওকে ভাল করে শিখিয়ে দাও। দ্বিতীয়বার আমাদের যখন মোলাকাত হবে তখন যেন এ মেয়ে এখানকার রেওয়াজ মত আচরণ করতে পারে।'

বড় মেয়েটা যে কথা বলতে শেখ মান্নানের কাছে এসেছিল তা আর বলতে পারলো না, ছোট মেয়েটাকে টানতে টানতে তাকে নিয়ে বাইরে চলে গেলো।

বেরোবার সময়ও সে বেশ উচ্চস্বরে শেখ মান্নানকে বলছিলো. 'আমার ওপর আপনার অসন্তুষ্ট হওয়া বৃথা। কারণ আমি আমার বস্‌দের নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়া অন্য কারো আদেশ মানতে বাধ্য নই।'

'বাইরে এসে বড় মেয়েটির প্রশ্নের জবাবে সে বলতে

লাগলো, 'কেন, আমি কি ফুরিয়ে গিয়েছিলাম! আমরা এত বড় এক তুফান থেকে এলাম, সুদীর্ঘ ও দুঃসহ সফরের ক্লান্তি ভুলে তাকে বলতে গেলাম, আমরা আপনার জন্য মূল্যবান উপহার নিয়ে এসেছি। আইয়ুবীর চার জানবাজ কমাণ্ডোকে ফাঁসিয়ে এনে হাজির করেছি আপনার দরবারে। কোথায় তিনি আমাদের কাছে দেখতে চাইবেন সেই উপহার, তা না করে কাজের কথা ফেলে হাত বাড়ালেন আমার দিকে। তুমিই বলো, তিনি এটি ঠিক করেছেন?'

'শান্ত হও। তুমি তাকে চেনো না, কিন্তু আমি চিনি। এই কেল্লায় আমি আগেও এসেছি। আমরা তার....'

মেয়েটির কথা শেষ হলো না, কামরা থেকে বেরিয়ে এলো শেখ মান্নান। বললো, 'কি বললে? কি উপহার এনেছো তোমরা?'

বড় মেয়েটি জবাব দিল। বললো, 'আপনার জন্য আমরা আইয়ুবীর চার কমাণ্ডো সেনা ধরে এনেছি।'

শেখ মান্নান আবার তাদেরকে ঘরে ডেকে নিল। বললো, 'বলো, পুরো কাহিনী খুলে বলো আমাকে।'

বড় মেয়েটি সফরের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বললো, 'আইয়ুবীর গোয়েন্দা বাহিনীর কমাণ্ডার আন নাসের ও তার তিন সাথীকে আমরা আপনার কাছে সোপর্দ করার জন্য নিয়ে এসেছি।' সে আন নাসেরদের সম্পর্কে যা জানে বিস্তারিত শেখ মান্নানকে শোনালো।

শেখ মান্নানের দু'চোখে এবার জ্বলে উঠলো অন্য রকম

আলো। সে আনন্দিত কণ্ঠে বললো, 'আমি এই লোকগুলো দিয়ে এমন কাজ আদায় করে নেবো, এতদিন কেবল যার স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি।'

ওরা শেখ মান্নানের কামরা থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিল, শেখ মান্নান বড় মেয়েটিকে ইঙ্গিতে কাছে ডেকে আস্তে করে বললো, 'কিন্তু আমি এ মেয়েকে আমার কামরায় অবশ্যই চাই।'

'এ বিষয়টি আমার উপরেই ছেড়ে দিন।' বড় মেয়েটি জবাবে বললো, 'দেখি, কত দূর কি করা যায়! আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমি তাকে রাজি করাতে চেষ্টা করবো, যাতে সে খুশী মনেই আপনার কাছে আসে। আশা করি আমি বিফল হবো না।'

যদিও শিশুকাল থেকেই এসব মেয়েদের পাপ ও নোংরা কাজের ট্রেনিং দেয়া হয়, তার মধ্যেই দু'একজন বেরিয়ে আসে, যাদের এসব ভাল লাগে না। এ মেয়েটি সেই প্রকৃতির। যখনই পাপের প্রশ্ন আসে, বিবেক যেন তাকে চাবুকপেটা করতে থাকে। খৃস্টানদের সযত্ন প্রশিক্ষণের পরও কেন যেন সত্য ও সুন্দরের প্রতি তার আকর্ষণ নিঃশেষিত হয় না। ক্রুশের ব্যাপারে তার আগ্রহ কম নয়, কিন্তু এ জন্য ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে, এতে তার মন কিছুতেই সায় দেয় না।

লোকদের ভুলিয়ে ক্রুশের জালে আবদ্ধ করবে কি, এই কাজের প্রতি তার নিজেরই ঘৃণা ধরে গেছে। এই পেশাকে

তার মনে হচ্ছে জঘন্যতম পেশা।

ওরা সারারাত সফর করেছে। নির্ঘুম রাত কেটেছে তাদের। ঘুমে তাদের চোখ বুঁজে আসছিল। শেখ মান্নানের কামরা থেকে বেরিয়ে নিজেদের কামরায় ফিরে ওরা ঘুমানোর চেষ্টা করলো। বড় মেয়েটি বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু ছোট মেয়েটির চোখে ঘুম এলো না। শেখ মান্নানের অভদ্র আচরণ এখনো তার মনটাকে বিষিয়ে রেখেছে। সে বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানালার পাশে বসলো, তারপর দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল বাইরে।

বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে জীবনের তিক্ত কথাগুলোই ভাবছিল সে। এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে নিজের অজান্তেই দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছে, খেয়াল করেনি।

তার এ কান্নার কারণ, এ পরিবেশকে সে যেমন মেনে নিতে পারছিল না, তেমনি আকাশ-পাতাল ভেবেও এর থেকে মুক্তির কোন পথও খুঁজে পাচ্ছিল না। এ বিশ্রি পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবে, পালানোর তেমন কোন জায়গাও ছিল না।

বড় মেয়েটি জেগে উঠলো। সঙ্গের মেয়েটিকে জানালার পাশে বসা দেখে উঠে তার কাছে এগিয়ে গেলো। তার চোখে অশ্রু দেখে পাশে বসে পড়ে বললো, 'দ্যাখ, প্রথম প্রথম মনের অবস্থা এমনটিই হয়। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যা কিছু করছি তা কেবল নিজেদের স্বার্থ বা বিলাসিতার জন্য নয়। আমাদের লক্ষ্য অনেক বড়, আমরা কাজ করছি ক্রুশের জন্য। ইসলামের নাম ও চিহ্ন পৃথিবীর মানচিত্র থেকে

মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে এ কাজ করে যেতে হবে। আমাদের সৈন্যেরা যুদ্ধের ময়দানে লড়ছে, আমাদেরকে লড়ে যেতে হবে আমাদের সেক্টরে। আবেগের ওপর নিজের বুদ্ধিকে জয়ী করো। দেহের অপবিত্রতা নিয়ে পেরেশান হয়ো না। আরে, দেহ তো অপবিত্র থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ গোসল না করো।'

'মুসলমান তাদের মেয়েদেরকে কেন এমনভাবে ব্যবহার করে না, যেমন আমাদের করা হয়?' ছোট মেয়েটা কান্না থামিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আমাদের সম্রাট, সৈন্য ও সেনাপতিরা কেন মুসলমান সৈনিকদের মত বীরত্বের সাথে লড়াই করতে পারে না? কাপুরুষের মত আমাদের কেন প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। কেন চোরের মত গোপনে মুসলমানদের হত্যা করতে হবে? সুলতান আইয়ুবীর কমাণ্ডোদের মত নিবেদিতপ্রাণ সৈন্য কেন খৃস্টানরা গঠন করে না? তাহলে কি বুঝবো, আমাদের জাতি কাপুরুষ ও ভীরু! শঠ ও প্রবঞ্চক?'

বড় মেয়েটা তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরে অস্থির কণ্ঠে বললো, 'ছি! এমন কথা আর কারো সামনে বলবে না! তাহলে তুমি খুন হয়ে যাবে। এখন আমরা শেখ মান্নানের কাছে আছি। সে গুপ্তঘাতক বাহিনীর নেতা। তাকে দিয়ে আমাদের বিরাট কাজ করিয়ে নিতে হবে। তাকে অসন্তুষ্ট করলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।'

'এই লোকটাকে দেখেই আমার ঘৃণা ধরে গেছে।' ছোট মেয়েটা বললো, 'এ লোক কোন বাদশাহ বা সম্রাট নয়,

একজন ভাড়াটে খুনী মাত্র। বড়জোর বলতে পারো খুনীদের সরদার। এ রকম হিংস্র খুনীদের আমি ঘৃণা করি। তাকে আমি আমার গায়ে হাত দেয়ারও যোগ্য মনে করি না।'

বড় মেয়েটা অনেকক্ষণ ধরে তাকে বুঝালো, শেষে তাকে রাজী করালো শেখ মান্নানের সাথে ভাল ব্যবহার করতে। সে তাকে আরও বললো, 'আরে, ভয়ের কিছু নেই। আমি তোকে শিখিয়ে দেবো, কি করে পুরুষদের শুধু লালসা ও লোভ দেখিয়ে দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা যায়। তুমি তো আমার কৃতিত্ব দেখোনি? আমি বড় বড় বাদশাহ এবং সম্রাটদেরও মাটিতে বসিয়ে রাখতে পারি ঘন্টার পর ঘন্টা! শেখ মান্নান তো সে তুলনায় কিছুই না।'

'তুমি কি এমন কোন উপায় বের করতে পারবে, যাতে আমরা তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি?' ছোট মেয়েটি বললো।

'চেষ্টা করে দেখবো।' বড় মেয়েটা বললো, 'তবে শেখ মান্নানকে অসন্তুষ্ট করে কিছুই করা যাবে না।'

ইতিমধ্যে দু'জন লোক কামরায় প্রবেশ করলো। তারা আইয়ুবীর চার কমাণ্ডো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলো মেয়েদের কাছে। বড় মেয়েটা তাদের সম্বন্ধে সব কিছু খুলে বললো ওদের। তাদেরকে কি জন্য এখানে আনা হয়েছে তাও বললো। তারপর জানতে চাইলো, 'তারা এখন কেমন আছে?'

'এখনও ঘুমিয়ে আছে।' একজন উত্তর দিল।

'তাদেরকে কি কারাগারে পাঠাবে?' ছোট মেয়েটি প্রশ্ন

করলো।

'কারাগারে পাঠানোর কোন প্রয়োজন নেই।' লোকটি উত্তরে বললো, 'এখান থেকে পালিয়ে ওরা যাবেই বা কোথায়?'

'আমি কি তাদের সাথে দেখা করতে পারবো?' ছোট মেয়েটি জিজ্ঞেস করলো।

'কেন পারবেনা।' সে উত্তর দিল, 'তারা তো তোমাদেরই শিকার। তাদের নিয়ে যেমন খুশী খেলা করার অধিকার তোমাদের অবশ্যই আছে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করো, তাদের কাছে বসে তাদেরকে আরো ভাল করে জালে আটকাও, কে মানা করছে তোমাদের।' এ কথা বলেই লোক দু'জন বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

সফরের সময় পথে বড় মেয়েটিকে সে তার মনের কথা খুলে বলেছিল। যদিও তার গার্জিয়ানরা তাকে ক্রুশের সেবায় উৎসর্গ করেছে, কিন্তু তার স্বপ্ন ছিল একটি সাজানো সংসার। এ পথে এসেছে সে অল্প কিছুদিন। বয়সে নবীন যুবতী। এখনো মনের আবেগ দমন করার কায়দা আয়ত্ব করে উঠতে পারেনি। আগ্রহ না থাকার কারণে অন্য মেয়েদের মত চালুও হয়ে উঠেনি। এই প্রথম তাকে পরীক্ষামূলকভাবে বাইরে পাঠানো হয়েছে। তার সাথে বড় মেয়েটিকে পাঠানো হয়েছে, যেন সে তাকে পারদর্শী করে তোলে।

বড় মেয়েটি এখন বড় বিপদে আছে ওকে নিয়ে। কারণ এ মেয়ের কাজ শেখার মোটেই আগ্রহ নেই, ফলে সে কোন

কাজেই তেমন সফল হতে পারছে না। পুরুষকে আঙ্গুলের ওপর নাচানোর কায়দা কানুন এখনো তার রপ্ত হয়নি। হবে কি করে, সে নিজেই এ কাজকে জঘন্য মনে করে। বুড়ো সেনাপতিদের ভীমরতি দেখে নাকি তার ঘেন্না পায়।

সাইফুদ্দিন যে কয়দিন তাকে খেলার পুতুল বানিয়ে রেখেছিল, সে কয়দিন সে ভালই ছিল। তেমন কোন অভিযোগ শোনা যায়নি তার কাছ থেকে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে সাইফুদ্দিনের বিপর্যয় তাকেও এলোমেলো করে দিল।

যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে দু:সাহসিক ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয়েছে তাকে। রাতভর সফর করতে হয়েছে। সেই কষ্ট ও ক্লান্তি দূর করার আগেই অভদ্রের মত তার দিকে শেখ মান্নানের হাত বাড়ানোটা তার মনে হয়েছে অমানবিক ও বর্বর আচরণ। বড় মেয়েটি বুঝতে পারলো, এ নিয়ে শেখ মান্নানের সাথে তার বাদানুবাদের বিষয়টিই তাকে অস্থির করে তুলেছে।

কিছুক্ষণ পর ছোট মেয়েটি বড় জনের বাঁধা সত্ত্বেও সেই কমাণ্ডো সৈন্যদের কামরায় গেল। সেখানে আন নাসের ও তার সাথীদেরকে সে ঘুমিয়ে থাকতে দেখলো।

আন নাসের আসলে জেগেই ছিল। সে ছোট মেয়েটাকে কামরায় প্রবেশ করতে দেখে ঘুমের ভান করে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো, এখন তার কি করা উচিত। শেষে এই সিদ্ধান্তে এলো, মেয়েটির সাথে কথা বলা দরকার।

সে, যেন হঠাৎ করেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল এমন ভাব

করে জেগে উঠলো। জেগেই সামনে মেয়েটিকে দেখে কিছুটা অবাক হওয়ার ভান করে উঠে বসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের কোথায় নিয়ে এসেছো? সত্যি করে বলো তো, তোমরা কেম্বা কি? এটা কি ধরনের জায়গা? জ্বীনদের আবাস কি এমন দূর্গের মত হয়?'

ছোট মেয়েটা আন নাসেরের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। কখনো সে দৃষ্টিতে ক্ষোভ, কখনো করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল। মেয়েটা যে আবেগ ও উত্তেজনায় অধীর তাও প্রকাশ পাচ্ছিল সে দৃষ্টিতে। আন নাসের মেয়েটার এ উত্তেজনা ও অধীরতা দেখে অবাক হলো। আবার জিজ্ঞেস করলো, 'কি, আমার প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না যে!'

মেয়েটি আন নাসেরের একদম কাছ ঘেষে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বললো, 'তোমরা কি পালাতে চাও?'

'তোমরা কে তাইতো জানি না। তোমরা শত্রু না মিত্র তা না জানলে আমরা কি করবো তা ঠিক করি কিভাবে? আগে বলো তোমরা কে? আমাদের নিয়ে তোমাদের পরিকল্পনা কি? তারপর আমি চিন্তা করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করবো।' আন নাসের উত্তর দিল।

মেয়েটা তার চোখে চোখ রেখে ফিসফিস করে বললো, 'আমি জ্বীন নই, মানুষ! আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। পালাতে চাইলে বলো, আমি সহযোগিতা করবো।'

মেয়েটির এ অযাচিত আশ্বাস বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলো না আন নাসের। বরং এতে তার প্রতি তার সন্দেহই বৃদ্ধি পেলো।

আন নাসের কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে মেয়েটি এবার তার খাটের দিকে এগিয়ে গেল এবং খাটের ওপর পা তুলে বসে পড়লো।

আন নাসের ছিল সুঠাম সুন্দর দেহের অধিকারী এক সুদর্শন যুবক। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সাহসী। সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডো বাহিনীতে যোগ দেয়ার আগে লোকে তাকে বলতো ডানপিটে, বাহিনীতে শামিল হওয়ার পর বন্ধুরা তাকে জানে দুঃসাহসী বলে ।

মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারতো এ যুবক। সে এবং তার মত অন্যান্য কমাণ্ডোদের নিয়ে খৃস্টানদের মধ্যে প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, সুলতান আইয়ুবীর এসব কমাণ্ডোদের দেখে মৃত্যুও ভয় পায়। মরুভূমির কঠিন জীবন, নদীর প্লাবন এবং কংকরময় পাহাড় ও প্রান্তর, এসব কোন বাঁধাই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতো না। বিপদ মুসিবতের কোন পরোয়াই ছিল না এইসব জানবাজদের। তারা আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভয় পেতো না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পিছপা হতো না।

যদি আন নাসের আছিয়াত কেল্লা পর্যন্ত নিজ ক্ষমতা বলে ও সজ্ঞানে সফর করতো, তবে এতটা ভীত হতো না। যদি তাদের বন্দী করে ধরে আনা হতো, তবু ভয় তাদের কাবু করতে পারতো না বরং তারা পালানোর হাজারটা পথ খুঁজে বের করতো। কিন্তু তাদেরকে নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন সে নেশার ঘোর চলে

গেলেও নেশার ঘোরে দেখা সবুজ মাঠ, ফলের বাগান, ঘাসের গালিচার কথা তারা ভুলেনি। তার মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবীর কোন অঞ্চলে হয়তো এমন সবুজ মাঠ ও ফলের বাগান থাকতেও পারে। হয়তো সে অঞ্চলটাই তারা পেরিয়ে এসেছে।

এখন তার খাটের ওপর যে মেয়েটি বসে আছে তাকে সে জ্বীনের মেয়েই মনে করেছিল। মেয়েটি তার কল্পনার চেয়েও বেশী সুন্দরী। আদম সন্তানের এমন মেয়েকে মানুষ কন্যা মেনে নিতে পারে না।

মেয়েটি যখন তাকে বললো, তার ওপর সে ভরসা করতে পারে, তাতে সে আরও ভীত হয়ে পড়লো। সে শুনেছিল, পরীরা প্রলোভন দেখানোতে ওস্তাদ। মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে তাদের সুবিধামত জায়গায় নিয়ে তারপর তাকে হত্যা করে ফেলে। এখন তার কাছে এই কেল্লাটা পরীদের প্রেতাত্মার কেল্লা বলে মনে হচ্ছিল। তার সাথীরা তখনও গভীর নিদ্রায় ডুবে ছিল আচ্ছন্ন হয়ে।

তারপরও সে মনকে বুঝালো, আমি কমাণ্ডার। আমাকে সাহস হারালে চলবে না। এভাবে নিজের মনকে প্রস্তুত করে সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমি তোমার ওপর কেন ভরসা করবো? কি জন্য নির্ভর করবো তোমার আশ্বাসের ওপর? তুমি আমার ওপর এত দয়া দেখাচ্ছো কেন? কেনই বা আমাকে এখানে আনলে? এ স্থানটাই বা কোথায়?'

'যদি তুমি আমাকে বিশ্বাস না করো, তবে তোমার

পরিণাম খুবই খারাপ হবে।' মেয়েটি বললো, 'তোমার হাত তোমার ভাইয়ের রক্তে রঞ্জিত হবে। তুমি সে রক্তকে ফুল মনে করে খুশী হবে। আমি এখনই তোমাকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না যে, কেন আমি তোমার প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ দেখাচ্ছি। তবে জেনে রেখো, আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্খী।'

কথা কয়টি বলে সে আর সেখানে অপেক্ষা করলো না, দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় ফিরে গেল।

০

আন নাসের ও তার সঙ্গীদেরকে শেখ মান্নানের দুই প্রহরী তাদের হেফাজতে নিয়ে গিয়েছিল। তখনও তাদের নেশার ঘোর কাটেনি। সারা রাত পায়ে হেঁটে এসে তারা ঢলে পড়ছিল ক্লান্তির কোলে।

প্রহরীরা তাদেরকে এক কামরায় নিয়ে এলো। কামরাটি বেশ বড়োসড়ো। তাতে কয়েকটি খাট পাতা। এক প্রহরী বললো, 'সারা রাত সফর করেছো, নিশ্চয়ই তোমাদের ঘুম পেয়েছে। নাও, এই খাটে শুয়ে পড়ো।'

বাধ্য ছেলের মত প্রহরীর হুকুম পালন করলো কমাণ্ডোরা। তারা পালংকের ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লো।

দুপুরের পর আন নাসেরের ঘুম ভাঙ্গলো। সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো। তার সাথীরা তখনও ঘুমাচ্ছে। সে তার আশপাশে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করলো কোথায় আছে।

সে দেখতে পেল, কামরার দরজা বন্ধ, তবে সবকটি জানালা খোলা। ঘরে খাটের ওপর ঘুমিয়ে আছে তার সাথীরা।

তার মনে পড়ে গেল গত রাতের সেই স্বপ্নময়তার কথা। চারদিকে অবারিত সবুজ মাঠ, চাঁদের কোমল জোসনা, সুবাসিত ফুলের বাগান, বিভিন্ন রংয়ের পাখির কিচির মিচির, গালিচার মত ঘাসের কোমল স্পর্শের কথা তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠতে লাগলো। মনে পড়লো তার মেয়ে দু'টির কথা। মনে পড়লো মরুভূমি ও মরুভূমির খরতাপের কথা। মরুভূমির নির্দয় আচরণ, সাথীদের স্মৃতিবিভ্রম, মরীচিকা ও সেই দুঃসহ কষ্টের কথা। এখন সেসব কথা তার দু:স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে।

সে বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল বাইরে। দেখতে পেলো, এটা একটা দুর্গ। সৈন্যরা আসা যাওয়া করছে। কিন্তু তাদের পোষাক আইয়ুবীর সৈন্যদের মত নয়।

সহসা সে পূর্ণ চৈতন্যে ফিরে এলো। অনুভব করলো, মরুভূমির বিপদসংকুল সফরটিই ছিল প্রকৃত সত্য ও বাস্তব। তারপর তার মেয়েদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। মেয়েদেরকে তার জ্বীন বলে মনে হয়েছিল। তার পরের ঘটনা তার কাছে অস্পষ্ট। মধুর স্মৃতিগুলোকে নিছক স্বপ্ন ও কল্পনা বলে মনে হলো তার। কিন্তু সে এখন কোথায়? এই প্রশ্ন তাকে অস্থির করে তুললো।

সে তার সঙ্গীদেরকে জাগালো না। জানালার কাছে

দাঁড়িয়ে সৈন্যদের আসা যাওয়া দেখতে লাগলো। এরা কার বাহিনী? এটা কোথাকার দুর্গ, কেমন ধরনের দুর্গ? এসব নানা প্রশ্ন কিলবিল করতে লাগলো তার মাথায়। কিন্তু সে এ কথা কাউকে জিজ্ঞেস করাও সমীচিন মনে করলো না।

সে ধারনা করলো, এটা নিশ্চয়ই কোন শত্রু বাহিনীর দুর্গ হবে। তবে কি সে তার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে বন্দী হয়ে আছে? কিন্তু এ কামরাতো কয়েদখানার কামরা নয়!

সে এক গোয়েন্দা ও কমাণ্ডো সৈনিক! কাউকে জিজ্ঞেস না করেই এই ধাঁধাঁর সমাধান বের করা উচিত তার। তার বিবেক ও বুদ্ধি সক্রিয় হয়ে উঠলো। তখনি এক অজানা ভয় এসে ভর করলো তার ওপর।

সে জানালা থেকে সরে গিয়ে খাটের ওপর বসে পড়লো। এ সময় বাইরে কারো পদশব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে শুয়ে পড়ে ঘুমের ভান করে নাক ডাকতে লাগলো।

সে আড় চোখে দেখলো, যে দুই মেয়ের সাথে তারা রাতে সফর করেছে, এ তাদেরই একজন। সে মেয়েটির সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল এবং উঠে বসে তার কাছ থেকেই জানতে পারলো, তারা জ্বীনপরী কিছু নয়, তারা তাদের মতই মানুষ। মেয়েটি তাকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বললো এবং এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে সাহায্যেরও আশ্বাস দিল। কিন্তু এ আশ্বাসে বিশ্বাস আনলো না আন নাসের।

মেয়েটি চলে যেতেই সে ভাবতে লাগলো, এর পিছনেও আবার কোন ষড়যন্ত্র নেই তো! যে মেয়ে তাকে ও তার

সাথীদের এখানে এনে বন্দী করেছে, সে কেন তাকে সহায়তা করতে যাবে। সে একটি বিষয়ে খুব চিন্তাগ্রস্ত হলো, মেয়েটি বলেছে, তাকে বিশ্বাস না করলে তার পরিণাম খুব খারাপ হবে। ভাইদের রক্তে রঞ্জিত হবে তার হাত। মেয়েটির এ হুমকি উড়িয়ে দেয়া যায় না। যে মেয়েরা তাদের নেশাগ্রস্ত করে ভুলিয়ে এনে বন্দী করতে পারে, তারা এমন নেশাও তাদেরকে পান করাতে পারবে, যার ঘোরে পড়ে ভাইদের হত্যা করতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে ওরা। কারণ আন নাসের শুনেছিল, ফেদাইন গুপ্ত ঘাতকদের হাতে বিচিত্র ধরনের নেশা আছে। আচ্ছা! এরা ফেদাইন নয়তো? প্রশ্নটা মনে হতেই আন নাসের আরেকবার শিহরিত হলো।

মেয়েটি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর। আন নাসের তখন খাটের ওপর বসে বসে ভাবছে, এমন সময় বাইরে আবারও কারো পায়ের আওয়াজ পেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় শুয়ে পড়ে নাক ডাকতে লাগলো। দু'জন লোক কামরার মধ্যে প্রবেশ করলো। একজন অন্যজনকে বললো, 'কিছুক্ষণ আগে ঘুমিয়েছে।'

'আচ্ছা, ওদের শুয়ে থাকতে দাও।' অন্যজন বললো, 'মনে হচ্ছে এদেরকে বেশী পান করানো হয়ে গেছে। এদের সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?'

'দুই খৃস্টান মেয়ে এদেরকে ফাঁসিয়ে নিয়ে এসেছে!' আগের লোকটি বললো, 'এরা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর কমাণ্ডো ও গোয়েন্দা। শুনেছি এরা খুবই চালাক ও দুর্ধর্ষ হয়।

এদেরকে ঠিক মত সম্মোহিত করতে পারলে অসাধ্য সাধন করা যাবে।'

লোক দু'টি চলে গেল। আন নাসেরের শরীরের প্রতিটি লোম শিউরে উঠলো। সে বুঝতে পারলো, ভয়ংকর এক চক্রের হাতে আটকা পড়েছে ওরা। মেয়ে দুটি তাদের ধোঁকা দিয়েছে। জ্বীন-পরী কিছু নয়, ওরা স্রেফ শিকার ধরার টোপ।

এখন তাকে জানতে হবে এটা কাদের কেল্লা, কি ধরনের কেল্লা! এ কেল্লা কোন এলাকায় অবস্থিত? তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে কেন সম্মোহিত করা হবে? কি কাজ করানো হবে তাদের দিয়ে?

সে আরো উপলব্ধি করলো, 'এটা একটা দূর্গ। এই কঠিন দূর্গ থেকে পালানো মোটেই সহজ ব্যাপার নয়!

কিন্তু যত কঠিনই হোক, আন নাসের সিদ্ধান্ত নিল; এখান থেকে তাদের পালাতেই হবে। সে তার সঙ্গীদেরকে জাগিয়ে তুললো।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-১৮

বিষাক্ত ছোবল

আসাদ বিন হাফিজ
ক্রুসেড-১৭
গাদ্দার
প্রকাশন